POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى

عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ط

اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ (الانعام:22)

এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালেম কে, যে আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁহার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে? নিশ্চয় যালেমরা কখনও সফলকাম হয় না।

(আল আনআম: ২২)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّی علی رسوله الکریم وعلی عبده المسیح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 7

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 5

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 3 ফেব্রুয়ারী, 2022 1 রজব 1443 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহর কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযুর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

কাদিয়ানের পূণ্যভূমিতে অনুষ্ঠিত হল ১২৬তম বাৎসরিক জলসা

কোভিড মহামারি পরিস্থিতি অন্তরের মলিনতা দুর করে নি, আল্লাহ্ তা'লার এই সতর্কবার্তা থেকে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করছে না। এই আচরণ চলতে থাকলে বড় ভয়াবহ পরিণাম সৃষ্টি হবে।

(আজ আমি ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষার কয়েকটি দিক তুলে ধরব। এই শিক্ষা বাস্তবায়িত হলে পৃথিবী শান্তি ও নিরাপত্তার আবাস হতে পারে।

ইসলাম শিক্ষা দেয়, একে অপরের ধর্মগুরুদের দোষারোপ করো না।

ইসলাম একথা বলে না যে, অন্যান্য সকল ধর্ম মিথ্যা। ইসলামের দাবি হল, প্রত্যেক জাতিতে নবীর আগমণ ঘটেছে। কুরআন করীমের আয়াত وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ○ এর আলোকে মুসলমানরা হযরত ঈসা (আ.) কে বা হিন্দুদের অবতারদেরকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে।

ইসলাম শিক্ষা দেয়, প্রত্যেক ধর্মের অনুসারী ও তাদের প্রবর্তকদের সম্মান কর।

ইসলাম সম্পর্কে এই ভ্রান্ত ধারণা তৈরী করা হয়েছে যে ইসলাম উগ্রপন্থার ধর্ম এবং প্রারম্ভিক যুগে জোর করে মুসলমান বানানো হয়েছে। অথচ ইসলাম একথা অস্বীকার করে।

ইসলাম ইহজগতে অমান্যকারীদের জন্য কোন শাস্তি নির্ধারণ করে নি। আজও যদি মুসলমানদের কর্মধারা এই শিক্ষাসম্মত হয়ে যায়, তবে ইসলামের প্রতি সমগ্র জগতের মনোযোগ নিবন্ধ হবে।

সংশোধনকে দৃষ্টিপটে রাখতে হবে। দেখতে হবে যে শাস্তি দিলে সংশোধন হবে না ক্ষমা করলে। সংশোধনই যেন প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়।

ইসলামের শিক্ষা দেয়, যাবতীয় লেন-দেনের সময় অপরের অধিকার রক্ষার বিষয়ে যত্নবান থাকা উচিত।

কোভিড পরিস্থিতির কারণে হুযুর আনোয়ার-এরর নির্দেশক্রমে এবং সরকারি নির্দেশিকা অনুসারে সীমিত পরিসরে জলসার আয়োজন। *লাইভ স্ট্রীমিং-এর মাধ্যমে ব্যপকহারে জলসা থেকে মানুষ উপকৃত হয়েছে। * লাইভ স্ট্রীমিং -এর মাধ্যমে এক লক্ষ ছয় হাজার ৬৪৬ জন মানুষ জলসা শুনেছে। জলসায় ৮ টি দেশের মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন।

তৃতীয় দিন ১ম অধিবেশন।

তৃতীয় দিনের প্রথম অধিবেশনের অনুষ্ঠান পরিচালিত হয় নাযির দাওয়াতেইলাল্লাহ্ মাননীয় মহম্মদ হামীদ কাউসার এর সভাপতিত্বে।কুরআন করীমের তিলাওয়াত করেন মাননীয় হাফিয সৈয়্যদ রসুল আহমদ সাহেব। তিনি সূরা নিসা ৫৮-৬০ নং আয়াতের তিলাওয়াত করেন। আয়াতগুলির উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন মৌলবী মাযহার ওয়াসীম সাহেব, নায়েব অফিসার জলসা সালানা কাদিয়ান। এরপর মাননীয় সাঈদ আহমদ মালকানা সাহেব হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নযম পরিবেশন করেন।

এই অধিবেশনের ১ম বক্তব্য রাখেন মাননীয় জাভেদ আহমদ লোন, নাযির দিওয়ান সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল 'বর্তমান যুগের নিরিখে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সুসংবাদমূলক ও সতর্কবাণীমূলক ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ।'

অধিবেশনের দ্বিতীয় বক্তব্য রাখেন নায়েব নাযির আলা ও নাযির নশর ও ইশাআত কাদিয়ান। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল 'হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ও তাঁর খলীফাগণের রচনাবলী এবং জামাতের পত্র-পত্রিকা অধ্যয়নের গুরুত্ব।

সমাপ্তি অধিবেশন এবং হুযুর আনোয়ারের সমাপনী ভাষণ

হুযুর আনোয়ারে ভাষণ এম.টি.এ তে সম্প্রচারিত হওয়ার পূর্বে লন্ডন স্টুডিও থেকে কাদিয়ান দারুল আমানের পবিত্র ভূমি এবং জলসা সালানা কাদিয়ানের বিষয়ে একটি তথ্যচিত্র উপস্থাপন করা হয়। এরপর জলসা আন্তর্জাতিক জলসায় পর্যবসিত হয়, যখন হুযুর আনোয়ারর হযরত খলীফাতুল মসীহ (আই.) -এর নেতৃত্বে লন্ডনের ইসলামাবাদের মসরূর ভবন থেকে এম.টি.এর যোগাযোগের মাধ্যমে জলসার সমাপনী অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার শুরু হয়। হুযুর জলসা উপস্থিত সকল অতিথিদেরকে আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহ-জানান। এরপর তিলাওয়াত করেন মাননীয় মাহমুদ আহমদ দরদী সাহেব। তিনি সূরা আলে ইমরানের ২০-২৩ নং আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং এর উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন। এরপর মাননীয় উমর শরীফ সাহেব হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর নযম পরিবেশন করেন।

এরপর ৮ পাতায়......

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

বি:দ্র:- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

প্রশ্ন: হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর একটি খুতবায় জুমার দিন এক বিশেষ মুহূর্ত সম্পর্কে বর্ণনা করেছিলেন, সেটি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। এছাড়াও ২০১৯ সালের যুক্তরাজ্যের জলসায় শেষ দিনের ভাষণে হুযুর আনোয়ার (আই.) তারাবীহর নামাযে পুরো পারা পড়ার পরিবর্তে ছোট ছোট সূরা পড়ার বিষয়ে বলেছিলেন। এ সম্পর্কে আরও স্পষ্টীকরণ চাওয়া হলে হুযুর আনোয়ার ২০২০ সালের, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখের চিঠিতে লেখেন-

আমি জুমআর দিন দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ মুহূর্তের বিষয়ে হাদীস এবং হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর বর্ণনা আলোকে বলেছিলাম যে সেই মুহূর্তটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং এর বিভিন্ন সময়ের কথা বলা হয়েছে। হাদিসবিশারদ ও ফিকাহবিদরাও বর্ণনা করেছেন যে, সেই মুহূর্তটি সূর্য হেলে যাওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে কোন একটি মুহূর্ত হতে পারে। আমার মতে এই মুহূর্তটির বিভিন্ন সময় নিয়ে বর্ণনা পাওয়া যায়, তার মধ্যে একটি প্রজ্ঞা রয়েছে। জুমআর গোটা দিনটা-ই একটি পবিত্র ও কল্যাণমণ্ডিত দিন।তাই সারাটি দিন দোয়ার মাঝে অতিবাহিত করা উচিত।

আর নামায সংক্ষিপ্ত করা প্রসঙ্গে বলি, আপনি আমার দুটি বক্তব্যকে গুলিয়ে ফেলেছেন। হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে আমি বলেছিলাম যে, হুযুর (সা.)-এর নিকট কোন এক ব্যক্তি একজন ইমামের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছিল যে, সে নাকি দীর্ঘ নামায পড়ায়। একথা শুনে হুযুর (সা.) অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেন।

এরপর আমি বলেছিলাম, যে নামায সংক্ষিপ্ত করার অর্থ এই নয় যে, দ্রুত মাথা ঠুকে নামায শেষ করে নেওয়া। এই প্রসঙ্গে সোসাল মিডিয়ায় প্রচারিত তারাবীহ নামাযের একটি ভিডিও-র কথা উল্লেখ করেছিলাম, যেখানে ইমাম কয়েক মিনিটে তারাবীহর সমস্ত রাকাত পড়িয়ে দেয়।

তাই আসল বিষয় ছিল নামায এতটা দীর্ঘায়িত করা উচিত নয় যে নামাযীরা বিরক্ত হয়ে ওঠে এবং তাদের মনে নামাযের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে। আর এমন সংক্ষিপ্ত করারও অনুমতি নেই যে, নামাযের পরিবর্তে তা মাথা ঠোকা বলে মনে হয়।

এর সঙ্গে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, হুযুর (রা.) যে নামাযগুলি সংক্ষিপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেগুলি হল ফরয নামায। এর কারণ হল ফরয নামায প্রত্যেক পুরুষের উপর বা-জামাত ফরয। তিনি বলেছেন, যেহেতু নামাযীদের মধ্যে অনেকে অসুস্থ, বৃদ্ধ,দুর্বল ও কাজের মানুষও থাকে, তাই ইমামের দায়িত্ব হল সকলের প্রতি দৃষ্টি রেখে সময় বিবেচনা করে নামায পড়ানো।

কিন্তু তারাবিহর নামায যেহেতু নফল নামায, সকলের অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নয়, বরং যারা সহজে এতে অংশগ্রহণ করতে পারে, তারা করুক, আর যারা অপারগ, তারা অংশ গ্রহণ না করলেও চলে, কোন অসুবিধে নেই। দ্বিতীয়ত, হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতাকলে তারাবিহর নামাযের প্রবর্তন হয় আর তিনি কুরআন করীমের কিরাতের জন্যই এটি চালু করেছিলেন। এইজন্য এতে তুলনামূলক কম দৈর্ঘের কিরাআত হওয়া বাঞ্ছনীয় আর সম্ভব হলে রমযান মাসে নামাযে তারাবীতে কুরআন পুরো revise দেওয়া উচিত।

প্রশ্ন: এক ভদ্রমহিলা তার ভাইয়ের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে বিধবাদের শোক পালন এবং ভাইয়ের জন্য বোনের শোক পালনের বিষয়ে ইসলামি নির্দেশ সম্পর্কে জানতে চেয়ে চিঠি লেখেন। হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০২০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারী তারিখের চিঠিতে লেখেন:

আনন্দ হোক বা দুঃখ, ইসলাম তার অনুসারীদেরকে প্রত্যেকটি বিষয়ে পথপ্রদর্শন করেছে। ইসলাম কোন প্রিয়জনের মৃত্যুতে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিয়েছে, এর পাশাপাশি তার বিরহ বেদনা ব্যক্ত করার অনুমতিও দিয়েছে। মা-বাবা, ভাই, সন্তানসহ মৃত ব্যক্তির সকল আত্মীয়কে সর্বাধিক তিন দিন পর্যন্ত শোক পালনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অপরদিকে স্ত্রীকে তার স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত শোক পালনের নির্দেশ দিয়েছে, যার উল্লেখ রয়েছে কুরআন মজীদের সূরা বাকারায়। এছাড়া হাদীসেও হুযুর (সা.) বিভিন্ন সময় এবিষয়ের উল্লেখ করেছেন। হযরত যয়নব বিনতে আবি সালমা (রা.) [যিনি হুযুর (সা.)-এর বৈমাতৃ বোন ছিলেন] -এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, 'আমি রসুলে করীম (সা.)-এর সহধর্মিণী হযরত উম্মে হাবীবা (রা.)-এর নিকট গেলে তিনি আমাকে বললেন- আমি রসুলুল্লাহ্ (সা.) কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাসী ব্যক্তির জন্য কারো মৃত্যুতে তিন দিনের বেশি শোক পালন বৈধ নয়। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কেবল তার স্ত্রী, যে স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। (বর্ণনাকারী বলেন) এরপর যখন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.)-এর ভাইয়ের মৃত্যু হল, (ভাইয়ের মৃত্যুর তিন দিন অতিক্রান্ত হয়েছিল) তখন আমি তাঁর কাছে গেলে তিনি সুগন্ধি আনতে বলেন এবং তা গায়ে মেখে বলেন- 'আমার সুগন্ধির প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু আমি নিজে রসুলুল্লাহ্ (সা.) কে মিম্বরের উপর বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাসী কোন মহিলার জন্য স্বামী ছাড়া অন্য কারো মৃত্যুতে তিন দিনের বেশি শোক পালন বৈধ নয়। স্বামীর মৃত্যুতে সে চার মাস দশদিন পর্যন্ত শোক পালন করবে।

(বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, ইহদাদুল মারআতে আল গায়রে জাওজিহা)

তাই বিধবা ছাড়া সকলের জন্য তিন দিন পর্যন্ত শোক পালনের অনুমতি রয়েছে, এর বেশি নয়-সে মাতা পিতা হোক, সন্তান হোক, ভাই-বোন কিম্বা বা অন্য কেউ।

বিধবাদের (চার মাস দশ দিন) শোক পালনের সময় সীমা প্রসঙ্গে বলতে হয় যে, ইসলাম এক্ষেত্রে কোনও প্রকার ব্যতিক্রম রাখে নি কিম্বা এই নির্দেশের বিষয়ে বয়সের কোন ছাড় দেয় নি। তাই বিধবাদের জন্য যথাসম্ভব নিজেদের বাড়িতে সময় কাটানো আবশ্যক। এই সময়ের মধ্যে সাজসজ্জা করা, সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ করা এবং অনাবশ্যকভাবে বাড়ির বাইরে বেরোনোর অনুমতি নেই।

ইদ্দতকালে বিধবা তার স্বামীর কবরে দোয়ার জন্য যেতে পারে। তবে শর্ত হল কবর সেই শহরেই অবস্থিত হতে হবে, যে শহরে সে বাস করে। এছাড়া যদি তার ডাক্তারের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হয়, তবে এটিও অপারগতার মধ্যে পড়ে। তাছাড়া যদি কোন বিধবার পরিবার তার চাকরীর উপর নির্ভরশীল হয়, যেখান থেকে ছুটি পাওয়া সম্ভব না হয় বা শিশুদেরকে স্কুলে দিতে ও নিতে যাওয়া এবং কেনাকাটার জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা না থাকে, তবে এগুলি সবই অপারগতার অন্তর্ভুক্ত হবে। এমন পরিস্থিতি হলে সেই মহিলার জন্য আবশ্যক হবে সোজা কাজে যাওয়া এবং কাজ শেষ করে ঘরে ফিরে আসা। অপারগতা এবং অনিবার্য কারণে বাড়ির বাইরে বেরোনোর অনুমতি রয়েছে এই সীমা পর্যন্তই; কোন ধরণের সামাজিক সমাবেশ বা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের অনুমতি নেই।

প্রশ্ন: একাকীনী মহিলার হজ্জে যাওয়ার বিষয়ে মাননীয় নাযিম সাহেব দারুল ইফতা প্রদত্ত একটি ফতোয়া (নিদান) সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার ২০২০ সালের ৪ঠা তারিখের চিঠিতে লেখেন-

আমার মতে হজ্জ এবং উমরার জন্য মহিলার সঙ্গে 'মুহাররম' পুরুষের শর্তটি সাময়িক নির্দেশ ছিল। ঠিক যেভাবে সেযুগে একাকীনী মহিলার জন্য সফর নিষিদ্ধ ছিল। কেননা সেই যুগে সফর অত্যন্ত কঠিন এবং দীর্ঘ হত, পথে খুব বেশি সুযোগ সুবিধা থাকত না। উপরন্তু রাস্তায় ডাকাতির ভয় ছিল অত্যন্ত বেশি। একবার আঁ হযরত (সা.)-এর কাছে যখন ডাকাতির বিষয়ে অভিযোগ করা হল, তখন তিনি ভবিষ্যতে শান্তিপূর্ণ সফরের ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়ে হযরত আদ্দি বিন হাতিমকে বললেন-

فَإِنْ طَالَتْ
بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ
حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللهَ۔

অর্থাৎ যদি তুমি দীর্ঘায়ু হও, তবে নিশ্চয় দেখবে যে উটের পিঠে গদিতে বসে থাকা একজন মহিলা হিরা থেকে কাবা কাবা তওবা করতে আসবে। আল্লাহ্ ছাড়া সে কাউকে ভয় করবে না।

এই হাদীসের শেষে হযরত আদ্দী বিন হাতিম বর্ণনা

فَرَأَيْتُ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ
حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ إِلَّا اللهَ۔ یعنی میں

অর্থাৎ আমি উটের পিঠে গদিতে বসে থাকা মহিলাকে দেখেছি তারা হিরা থেকে সফর শুরু করে কাবা তওয়াফ করেছে আর আল্লাহ্ ছাড়া তারা কাউকে ভয় করে না।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মানাকিব)

হিরা ছিল সেই যুগে ইরান সাম্রাজ্যের একট শহর, যা কুফার নিকটবর্তী ছিল। এই দিক থেকে সেই যুগে এটি বেশ কয়েক দিনের যাত্রাপথ ছিল। অতএব, সেই যুগে যদি কোন মহিলা হিরা থেকে যাত্রা শুরু করে কয়েকদিন পর মক্কার খানা কাবা তওয়াফ করতে আসতে পারে, তবে এই যুগে কয়েক ঘন্টার বিমান সফর করে একজন মহিলা উমরা বা হজ্জ করতে কেন আসতে পারে না?

প্রশ্ন: আমি পড়েছি যে একজন মোমেনের জন্য সর্বদা কল্যাণই রয়েছে।কিন্তু অপরদিকে এও বলা হয় যে, ইহজগত মোমেনের জন্য জাহান্নাম। এর মধ্যে কোন কথাটি ঠিক? আর একথাটি কি ঠিক যে, একটি নামায বাকি থাকলে বিগত চল্লিশ বছরের নামায বিফলে যায়?

হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০২০ সালের ২০ শে ফেব্রুয়ারী তারিখের চিঠিতে লেখেন- আসল কথা হল একজন প্রকৃত মোমেনের জাগতিক বস্তুসমূহে কোন আগ্রহ থাকে না। সে সেগুলিকে আল্লাহর নির্দেশে কেবল অস্থায়ী উপকরণ হিসেবে ততটুকুই ব্যবহার করে, যতটুকু তার প্রয়োজন রয়েছে। খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন থাকে সব সময়ের লক্ষ্য। তাই একজন মোমেন যেহেতু জাগতিক বস্তুর পিছনে এমনভাবে ছোটে না যে সেটি তার হৃদয়ে থাকা খোদার স্মৃতিকে পাছে মুছে

এরপর ১০ পাতায়......

জুমআর খুতবা

কুরাইশরা যখন মহানবী (সা.)-কে কষ্ট দেওয়ার বিষয়ে একমত হয় এবং তারা একটি চুক্তিপত্র লিখে, তখন হযরত সিদ্দীক (রা.) সেই কষ্টের যুগেও মহানবী (সা.)-এর সঙ্গী ছিলেন।

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী দ্বিতীয় খলীফায়ে রাশেদ সিদ্দীকে আকবার হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের জন্য বিশেষ দোয়ার আহ্বান।

দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন জগদ্বাসীকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে চেনার তৌফিক দান করেন এবং সকল অনিষ্টের মূল উৎপাটন করেন আর বিশ্ববাসী যেন তাদের সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে সক্ষম হয়।

জানাযা গায়েব: মাননীয় আল হাজ আব্দুর রহমান এনিন সাহেব (জলসা সালানা ঘানার অফিসার), মাননীয় আযইয়াব আলি মহম্মদ আল জাবালী (জর্ডন), মাননীয় দ্বীন মহম্মদ শাহিদ সাহেব (প্রাক্তন মুরুব্বী), মাননীয় মিঞা রফিক আহমদ সাহেব (রাবোয়া) এবং মাননীয়া কানিতা যাফর সাহেবা (যুক্তরাষ্ট্রের জামাতের সাবেক আমীর আহসানুল্লাহ্ যাফর সাহেবের স্ত্রী)

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১, এর জুমুআর খুতবা (৩১ ফাতাহ, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন-

সওর গুহায় হযরত আবু বকর (রা.)-এর (আশ্রয় গ্রহণ করার) ঘটনা সম্পর্কে গত খোতবায় আলোচনা হচ্ছিল। এই ঘটনা সম্পর্কে অর্থাৎ সওর গুহায় শত্রুদের পৌঁছে যাওয়া সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে উক্ত আয়াতটিতে আল্লাহ্ তা'লা যা বলেছেন তার অনুবাদ হল: 'যদি তোমরা এই রসূলকে সাহায্য না-ও কর তবুও (স্মরণ রেখ!) আল্লাহ্ সেই সময়ও তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফিররা তাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেছিল, এমতাবস্থায় যে, সে ছিল দু'জনের মধ্যে একজন। যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল; এবং সে তার সঙ্গীকে বলছিল, দুঃখ কর না, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। অতএব আল্লাহ্ তাঁর প্রতি প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন আর তাঁকে এমন এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা সাহায্য করেছেন যাদেরকে তোমরা কখনও দেখ নি। আর যারা অবিশ্বাস করেছিল তিনি তাদের কথাকে হেয় প্রতিপন্ন করে দেখালেন, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র কথাই প্রাধান্য রাখে। বস্তুত আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী ও পরম প্রজ্ঞাময়'।

(সূরা আত্ তাওবা: ৪০)

পবিত্র কুরআনে সওর গুহার ঘটনার প্রেক্ষাপটে এই আলোচনা রয়েছে। মক্কার কাফিররা গুহার মুখে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছিল আর তা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) একথা ভেবে বিচলিত হন যে, যদি মহানবী (সা.)-কে এখানে ধরে ফেলা হয় তাহলে কী হবে? কেননা গোটা ইসলামের অস্তিত্বই তো এই আশিসপূর্ণ সত্তার কারণেই বিদ্যমান বা টিকে আছে। মহানবী (সা.) সম্পর্কে এই বিচলিত অবস্থা যখন তিনি (সা.) দেখেন আর্থাৎ তিনি (সা.) যখন দেখেন যে, হযরত আবু বকর (রা.) বিচলিত হয়ে পড়ছেন (তখন) মহানবী (সা.) বলেন, لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا: হে আবু বকর! দুঃখিত হয়ো না, নিশ্চয় আমাদের খোদা আমাদের সাথে আছেন।

(শারাহ যারকানি আলা মোয়াহিবুল লাদানি, ২য় খণ্ড, পৃ: ১২২-১২৩)

মহানবী (সা.)-এর পশ্চাদ্ধাবন করে তারা যখন সওর পাহাড়ের গুহার কাছে পৌঁছে তখন খোঁজী বা অনুসন্ধানী বলে, আমি বুঝতে পারছি না যে, এরপর তারা দু'জন কোথায় নিজেদের পা রেখেছেন? এরপর তারা যখন গুহার নিকটবর্তী হল, তখন অনুসন্ধানী বলল, আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরা যার সন্ধানে এসে ছ তিনি এখান থেকে আর সম্মুখে অগ্রসর হন নি।

(তারিখুল খামিস, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৫, ফি ওয়াকায়েউস সুন্নাতুল উলা)

গুহার মুখে দাঁড়িয়ে সেই অনুসন্ধানী যখন এসব কথা বলছিল তখন কেউ একজন গুহার মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখতেও চায়, তখন উমাইয়্যা বিন খালফ কঠোর অথচ ভ্রুক্ষেপহীন কণ্ঠে বলে, এই (মাকড়াশার) জাল এবং এই গাছ তো আমি মুহাম্মদের জন্মের পূর্বে থেকেই এখানে দেখে আসছি। তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে? সে এখানে কীভাবে থাকতে পারে! তাই এখান থেকে চলো; অন্য কোথাও গিয়ে তাকে খুঁজি। আর একথা বলে তারা সেখান থেকে ফেরত চলে আসে।

(আল মোয়াহিবুল লাদানিয়া লি আল্লামা কুস্তালানি, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৯২-২৯৩, মাতবুয়াতুল মাকতাবুল ইসলামি, বেরুত, ২০০৪)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তকে মক্কার কুরাইশদের ঘোষণা এবং মহানবী (সা.)-এর পশ্চাদ্ধাবন করা সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছেন তা হলো, 'তারা সর্বসাধারণ্যে ঘোষণা করে দেয় যে, মুহাম্মদ (সা.)-কে যে জীবিত অথবা মৃত ধরে আনবে তাকে পুরস্কার হিসেবে একশ' উট প্রদান করা হবে। পুরস্কারের লোভে অনেকেই মক্কার চতুষ্পার্শ্বে এদিক সেদিক বেরিয়ে পড়ে। মক্কার কুরাইশ নেতারাও অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে তাঁর (সা.) পিছু নেয় এবং ঠিক সওর গুহার মুখে গিয়ে পৌঁছে। সেখানে গিয়ে খোঁজী বলে, সামনে আর পায়ের ছাপ নেই। তাই মুহাম্মদ হয় আশপাশে কোথাও লুকিয়ে আছে অথবা আকাশে চলে গেছে। কেউ বলল, কোন ব্যক্তি এই গুহার ভিতরে গিয়ে দেখে আসো। কিন্তু অপর এক ব্যক্তি বলে, এ কি কোন বিবেক সম্মত কথা! কেউ কি এ গুহায় গিয়ে লুকোতে পারে! এ তো এক অত্যন্ত অন্ধকার ভয়াবহ স্থান আর আমরা এটিকে সর্বদা এমন-ই দেখে এসেছি। এ বর্ণনাও দেখা যায় যে, গুহার মুখে যে গাছ ছিল, মহানবী (সা.) ভিতরে প্রবেশ করার পর সেটিতে মাকড়শা জাল বুনেছিল আর গুহার ঠিক মুখে গাছের ডালে কবুতর বাসা বানিয়ে ডিম পেড়ে রেখেছিল।" হযরত মির্যা বশির আহমদ (রা.)-এর মতে "এই রেওয়ায়েতটি দুর্বল কিন্তু সত্যিই যদি এমনটি হয়ে থাকে তাহলে আদৌ অবাক হওয়ার কিছু নেই কেননা মাকড়শা অনেক সময় কয়েক মিনিটে এক বিস্তৃত জায়গা জুড়ে জাল বুনতে সক্ষম, কবুতরের বাসা তৈরি করতে এবং ডিম দিতেও বিলম্ব হয় না। তাই আল্লাহ্ তা'লা যদি নিজ রসূলের সুরক্ষাকল্পে এমন অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে থাকেন, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই বরং সেই মুহূর্তে এমনটি হওয়া যৌক্তিক মনে হয়। যাহোক, কুরাইশের কোন ব্যক্তি সম্মুখে অগ্রসর হয় নি, আর সেখান থেকেই সব লোক ফেরত চলে যায়। তিনি (রা.) আরও লেখেন, রেওয়াতে উল্লেখ আছে, কুরাইশরা এতটাই নিকটে গিয়ে পৌঁছে যে, গুহার ভিতর থেকে তাদের পা দেখা যাচ্ছিল এবং তাদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল। সে সময় হযরত আবু বকর (রা.) শঙ্কিত চিত্তে ক্ষীণকণ্ঠে মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! কুরাইশ এতটাই নিকটে যে, তাদের পা দেখা যাচ্ছে। তারা যদি একটু অগ্রসর হয়ে উঁকি দেয় তাহলে আমাদেরকে দেখতে পাবে। মহানবী (সা.) বলেন, لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا: ভয় পেও না, আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। وَمَا ظَنُّكَ يَا اَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اللّٰهُ ثَالِثُهُمَا অর্থাৎ হে আবু বকর! এই দু'ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কী ধারণা, যাদের সাথে তৃতীয়জন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা? অপর এক রেওয়ায়েতে উল্লেখ করা হয়েছে, কুরাইশ যখন গুহার কাছে গিয়ে উপনীত হয়, তখন হযরত আবু বকর (রা.) ভীষণ শঙ্কিত হন। মহানবী (সা.) তার (রা.) শঙ্কিত অবস্থা দেখে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, শঙ্কার কোন কারণ নেই। তখন হযরত আবু বকর (রা.) ধরা কণ্ঠে বলেন, اِنْ قُتِلْتُ فَاَنَا رَجُلٌ وَاحِدٌ وَاِنْ قُتِلْتَ اَنْتَ هَلَكَتِ الْاُمَّةُ অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি যদি নিহত হই তাহলে আমি তো কেবল একজন সাধারণ মানুষ কিন্তু আল্লাহ্ না করুন, আপনার যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে পুরো উম্মতই যেন ধ্বংস হয়ে গেল। তখন তিনি (সা.) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এলহাম পেয়ে বলেন, لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا: অর্থাৎ হে আবু বকর! তুমি শঙ্কিত হয়ো না কেননা আল্লাহ্

আমাদের সাথে আছেন আর আমরা উভয়ে তাঁর সুরক্ষা চাদরে আবৃত। অর্থাৎ তুমি আমার কারণে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছ, আর তুমি নিষ্ঠার আতিশয্যে নিজের প্রাণের বিষয়ে ভ্রুক্ষেপহীন। তবে আল্লাহ্ তা'লা এখন কেবল আমাকে সুরক্ষা করবেন না বরং তোমাকেও সুরক্ষা করবেন আর তিনি আমাদের উভয়কে শত্রুর অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখবেন।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ, পৃ: ২১৬-২১৭)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে এক জায়গায় বলেন, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে মহানবী (সা.) যখন হিজরতের অনুমতি পেলেন, তখন তিনি (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে সাথে নিয়ে সওর পাহাড়ে গেলেন যা মক্কা থেকে প্রায় ৬/৭ মাইল দূরে অবস্থিত আর সেই পাহাড়ের চূড়ায় একটি গুহায় আশ্রয় নিলেন। প্রভাতে যখন কাফিররা দেখে যে, তিনি (সা.) নিজ বাড়িতে নেই আর সব ধরণের পাহারা দেওয়া সত্ত্বেও মহানবী (সা.) সফলভাবে বেরিয়ে গেছেন, তাই তাৎক্ষণিকভাবে তারা তাঁর (সা.) খোঁজে বেরিয়ে পড়ে আর মক্কার কয়েকজন দক্ষ খোঁজী- যারা পদচিহ্ন দেখার বিষয়ে বেশ পারদর্শী ছিল, তাদেরকে সাথে নেয় এবং তারা খুঁজতে খুঁজতে (কুরাইশদেরকে) সওর গুহার কাছে নিয়ে আসে এবং বলে মহানবী (সা.) যদি থেকে থাকেন তাহলে এই গুহাতেই আছেন। এরপর আর কোন পদচিহ্ন নেই। অবস্থা এমন সংকটাপন্ন ছিল যে, শত্রু ঠিক গুহার মুখে দাঁড়িয়ে ছিল আর গুহার মুখ এতটা সংকীর্ণও ছিল না যে, ভিতরে দেখা কঠিন হবে বরং এটি খোলা মুখবিশিষ্ট প্রশস্ত একটি গুহা ছিল। ভেতরে কেউ বসে আছে কিনা তা খুব সহজেই উঁকি মেরে দেখা সম্ভব ছিল কিন্তু এমন অবস্থায়ও মুহাম্মদ (সা.)-এর মধ্যে কোনো ভয়-ভীতি ছিল না বরং তাঁর (সা.) পবিত্রকরণ শক্তির মাধ্যমে হযরত আবু বকর (রা.) -এর হৃদয়ও শঙ্কামুক্ত থাকে এবং তিনি (রা.) মুসা (আ.)-এর সঙ্গীদের ন্যায় একথা বলেন নি যে, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম বরং তিনি (রা.) যদি কোনো কথা বলে থাকেন তা হলো, 'হে আল্লাহর রসুল (সা.)! শত্রুরা এতটাই নিকটে পৌঁছে গেছে যে, তারা যদি সামান্য নিচে উঁকি দেয় তাহলে আমাদের দেখতে পাবে।' কিন্তু মহানবী (সা.) বলেন, 'উসকুত ইয়া আবা বাকরিন, ইসনানিল্লাহু সালেসুহুমা' হে আবু বকর (রা.) চুপ থাকো, আমরা এই মুহূর্তে কেবল দুজন নই, আমাদের সাথে তৃতীয় সত্তা খোদা তা'লা রয়েছেন, তাই তাদের জন্য আমাদেরকে দেখা কীভাবে সম্ভবপর হতে পারে? অতএব এমনই হয়। শত্রুরা গুহার মুখে পৌঁছে যাওয়া সত্ত্বেও সামনে গিয়ে উঁকি মেরে দেখার সুযোগ পায় নি আর বিড়বিড় করে অভিশাপ দিতে দিতে তারা সেখান থেকে চলে যায়। বস্তুত এ ঘটনার একটি দিক হচ্ছে, হযরত মুসা (আ.)-এর সাথীরা ভীতত্রস্ত হয়ে একথা বলেছিল যে, হে মুসা (আ.) আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। মোটকথা তারা নিজেদের সাথে মুসা (আ.)-কে জড়িয়ে নেয় আর ধারণা করে যে, আমরা সবাই ফেরাউনের হাতে ধরা পড়তে যাচ্ছি। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর খোদার প্রতি ভরসা তাঁর (সা.) সাথীর ওপর এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, তার (রা.) মুখ থেকে একথা বের হয় নি যে, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। তিনি (রা.) শুধুমাত্র একথা বলেছিলেন যে, শত্রুরা আমাদের এতটাই নিকটে চলে এসেছে যে, তারা চাইলে আমাদেরকে দেখে ফেলতে পারে। কিন্তু মহানবী (সা.) এ ধারণাকেও পছন্দ করেন নি। তিনি (সা.) বলেন, এমন আশঙ্কা করো না কেননা, এখন আমরা দু'জন নই বরং আমাদের মাঝে তৃতীয় সত্তা হিসাবে আমাদের খোদা আছেন।"

(তফসীর কবীর, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১৪৬-১৪৭)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) অন্য এক জায়গায় বলেন, "যখন মক্কার লোকেরা রসুল (সা.)-এর ওপর সীমাতিরিক্ত অত্যাচার শুরু করে, যার ফলে ধর্মীয় কাজ বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল, তখন আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে মক্কা ছেড়ে অন্যত্র হিজরত করার নির্দেশ প্রদান করেন। তাঁর (সা.) এর সাথে হযরত আবু বকর (রা.) মক্কা ছেড়ে যাওয়া জন্য প্রস্তুতি নেন। এর পূর্বে আবু বকর (রা.)-কে হিজরত করে যাওয়ার জন্য কয়েকবার বলা হয়েছিল কিন্তু তিনি মহানবী (সা.)-কে ছেড়ে যেতে প্রস্তুত ছিলেন না। হিজরতের জন্য যাত্রার সময় মুহাম্মদ (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কেও নিজের সাথে নিয়ে নেন। রাতের বেলা তারা যাত্রা করেন আর এক জায়গায় গিয়ে তাঁরা আশ্রয় নেন, যেটি ছিল সামান্য একটি গুহা মাত্র। সেটির মুখ ২/৩ গজ চওড়া হবে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হজ্জের সময় আমিও সেই জায়গাটি দেখেছি। মক্কার লোকেরা যখন জানতে পারল যে, তিনি (সা.) চলে গেছেন তখন তারা তাঁর (সা.) পশ্চাধাবন করল। আরবে অনেক অভিজ্ঞ খোঁজী ছিল যাদের সাহায্যে পশ্চাধাবনকারীরা ঠিক সেখানে পৌঁছে যায় যেখানে রসুল (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) আশ্রয় নিয়েছিলেন। খোদার কুদরতে গুহার মুখে কিছু চারা গাছ উদ্গত হয়েছিল, যেগুলোর ডালপালা পরস্পর একাকার হয়ে ছিল। যদি তারা এই ডালপালাকে সরিয়ে ভিতরে দেখত তাহলে তারা রসুল (সা.) ও হযরত আবু বকর (রা.)-কে বসা অবস্থায় দেখতে পেত। খোঁজী যখন গুহার মুখে পৌঁছায় তখন সে বলে, হয় মুহাম্মদ আকাশে চলে গেছে না হয় গুহার ভেতরে লুকিয়ে আছে, এছাড়া আর কোথাও যায় নি। চিন্তা করে দেখ! সেটি কেমন স্পর্শকাতর মুহূর্ত ছিল! তখন হযরত আবু বরক (রা.) বিচলিত হয়েছিলেন কিন্তু নিজের জন্য নয় বরং রসূল করীম (সা.)-এর জন্য। তখন মহানবী (সা.) বলেন, لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ভীত হচ্ছেন কেন? খোদা তা'লা আমাদের সাথে আছেন। নবী করীম (সা.) যদি নিজ সত্তায় খোদা তা'লাকে না দেখতেন তাহলে এমন সংকটময় সময়ে ভয় পাবেন তা কী করে সম্ভব। অত্যন্ত শক্তিশালী হৃদয়ের অধিকারী মানুষও শত্রু হঠাৎ করে সামনে এসে গেলে ভয় পেয়ে যায় কিন্তু রসুল করীম (সা.)-এর একেবারে নিকটে বরং বলা উচিত মাথার ওপর শত্রু দাঁড়িয়েছিল আর শত্রুও তারা যারা বিগত ১৩ বছর যাবৎ প্রাণনাশের চেষ্টা করে আসছিল এবং যাদেরকে খোঁজি বলছিল, হয় তিনি আকাশে উঠে গেছেন নয়তো এখানেই বসে আছেন, এখান থেকে আগে যান নি; এমন সময় রসুল করীম (সা.) বলেন, لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا অর্থাৎ খোদা তা'লা আমাদের সাথে আছেন, আপনি ভীত হচ্ছেন কেন? এটি খোদা তা'লার ইরফান বা খোদা-সংক্রান্ত জ্ঞানই ছিল যার জন্য মহানবী (সা.) একথা বলেছেন। তিনি (সা.) নিজের মাঝে খোদা তা'লাকে প্রত্যক্ষ করতেন এবং উপলব্ধি করতেন যে, আমার ধ্বংসের মাধ্যমে খোদা তা'লার ইরফান বা তত্ত্বজ্ঞানের বিনাশ ঘটবে, তাই কেউ আমাকে ধ্বংস করতে পারবে না।"

(ইরফানে ইলাহি অউর মুহাব্বত বিল্লাহি কা আলি মারতাবা, আনোয়ারুল উলুম, একাদ্দশতম খণ্ড, পৃ: ২২৩-২২৪)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "হযরত ঈসা (আ.) তাঁর সঙ্গ দেওয়ার জন্য কেবল এক ব্যক্তিকেই সাথে নিয়েছিলেন, অর্থাৎ টমাসকে। যেভাবে আমাদের নবী (সা.) মদিনার উদ্দেশ্যে হিজরত করার সময় কেবল আবু বকর (রা.)কে সাথে নিয়েছিলেন। কেননা রোমান সাম্রাজ্য হযরত ঈসা (আ.)কে বিদ্রোহী আখ্যা দিয়েছিল। এই অপরাধেই পিলাতকেও রোমান সম্রাটের নির্দেশে হত্যা করা হয়েছিল, কেননা নেপথ্যে তিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর সাহায্যকারী ছিলেন এবং তার স্ত্রীও হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারী ছিল। তাই হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্য কোন দলবল সাথে না নিয়ে সংগোপনে এই দেশ ত্যাগ করা আবশ্যক ছিল। এজন্য এই সফরে তিনি কেবল টমাস নামক শিষ্যকে সাথে নেন যেভাবে আমাদের নবী (সা.) তাঁর মদিনার সফরে কেবল হযরত আবু বকর (রা.)কে সাথে নিয়েছিলেন। আর আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর বাকি সাহাবীরা যেভাবে বিভিন্ন পথ ধরে মহানবী (সা.)-এর সমীপে এসে উপস্থিত হন অনুরূপভাবে হযরত ঈসা (আ.)-এর হাওয়ারীরাও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পথ ধরে ঈসা (আ.)-এর নিকট গিয়ে পৌঁছে।"

(পরিশিষ্ট- বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম ভাগ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২১, পৃ: ৪০২)

অপর একস্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নিষ্ঠা সেই বিপদের যুগে প্রকাশিত হয় যখন মহানবী (সা.)কে অবরুদ্ধ করা হয়। কোন কোন কাফের দেশান্তরের মতামত দিলেও প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত মহানবী (সা.)কে হত্যা করার পক্ষে ছিল। এমন (সংকটময়) যুগে হযরত আবু বকর (রা.) তার নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন যা সর্বকালের জন্য অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

এই সংকটময় মুহূর্তের জন্য মহানবী (সা.)-এর এই মনোনয়নই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর সততা ও সুমহান বিশ্বস্ততার অকাট্য প্রমাণ। মহানবী (সা.)-এর মনোনয়নের স্বরূপও এমনই ছিল। তখন তাঁর কাছে সত্তর-আশি জন সাহাবী ছিলেন। যাদের মধ্যে হযরত আলী (রা.)ও ছিলেন কিন্তু তাদের সবার মধ্যে থেকে তিনি (সা.) তাঁর সঙ্গ দেওয়ার জন্য হযরত আবু বকর (রা.)কে মনোনীত করেন। এর রহস্য কী? মূলকথা হলো- নবী আল্লাহ্ তা'লার চোখে দেখেন এবং তাঁর জ্ঞান ও উপলব্ধির ক্ষমতা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আসে। এজন্য আল্লাহ্ তা'লাই দিব্যদর্শন ও এলহামের মাধ্যমে বলে দিয়েছেন যে, হযরত আবু বরক (রা.)ই হলেন একাজের জন্য সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি। হযরত আবু বকর (রা.) এমন কঠিন মুহূর্তে তাঁর (সা.) সঙ্গী হয়েছেন। এটি অনেক ভয়ঙ্কর পরীক্ষার সময় ছিল। হযরত ঈসা (আ.) যখন এমন সময়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন তখন তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে ছেড়ে পলায়ন করেছিল আর একজন অভিসম্পাতও করেছিল কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের প্রত্যেকেই পূর্ণ বিশ্বস্ততার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন। মোটকথা, হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে (সা.) সর্বক্ষণ সঙ্গ দিয়েছেন এবং সওর গুহা নামে প্রসিদ্ধ একটি গুহায় তিনি আত্মগোপন করেন। দুর্বৃত্তপরায়ন কাফের যারা তাঁর অনিষ্ট সাধনের জন্য ষড়যন্ত্র করেছিল তারা তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে সেই গুহা পর্যন্ত চলে আসে। তখন হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, এরা তো একেবারে মাথার ওপরেই এসে উপস্থিত। কেউ একটু উঁকি মারলেই দেখতে পাবে আর আমরা ধরা পড়ে যাব। সেই সময় মহানবী (সা.) বলেন, لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا। অর্থাৎ ভয় পেয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সাথে আছেন। এই শব্দে প্রণিধান কর! কেননা এখানে মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর সিদ্দীক

(রা.)কে নিজের সাথে যুক্ত করেছেন। দেখ! তিনি বলেছেন, لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا শব্দের মাঝে উভয়েই অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তোমার এবং আমার সাথে আছেন। আল্লাহ্ তা'লা এক পাল্লায় মহানবী (সা.)-কে এবং অপর পাল্লায় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে রেখেছেন। এখন তারা উভয়েই পরীক্ষার সম্মুখীন, কেননা এটিই সেই স্থান যেখান থেকে হয় ইসলামের ভিত্তি রচিত হবে নয়তো ধ্বংস হয়ে যাবে। শত্রুরা গুহার মুখে উপস্থিত এবং নানা ধরণের মতামত ব্যক্ত করা হচ্ছে। কেউ বলছে, এই গুহায় তল্লাশি কর, কেননা এখানে এসেই পদচিহ্ন শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তাদেরই কেউ কেউ বলছে, এখান দিয়ে মানুষ কীভাবে যেতে পারে যেখানে মাকড়সা জাল বুনেছে আর কবুতর ডিম পেড়ে রেখেছে? এ ধরণের কথাবর্তার আওয়াজ ভিতরে যাচ্ছে আর তাঁরা তা পরিষ্কার শুনছেন। শত্রুরা তাঁকে নিশ্চিহ্ন করার প্রত্যয় নিয়ে এসেছে এবং উম্মাদের ন্যায় ছুটে এসেছে অথচ তাঁর অসাধরণ বীরত্ব দেখ! শত্রু নাকের ডগায় থাকা সত্ত্বেও মহানবী (সা.) তাঁর সত্যিকার সঙ্গী হযরত আবু বকর (রা.)কে বলছেন, لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا এই শব্দগুলি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, মহানবী (সা.) মুখেই বলেন, কেননা এটি বলতে গেলে শব্দের প্রয়োজন, ইশারা ইঙ্গিতে কাজ চলে না। বাইরে শত্রুরা শলাপরামর্শ করছে আর ভিতরে সেবক ও মনিব পরস্পর আলাপচারিতায় ব্যস্ত। এ বিষয়ের প্র তি কোন ভ্রুক্ষেপ নেই যে, শত্রুরা শব্দ শুনে ফেলবে। এটি হলো আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও তত্ত্বজ্ঞানের প্রমাণ এবং খোদার প্রতিশ্রুতির প্রতি পূর্ণ ভরসা। মহানবী (সা.)-এর বীরত্ব প্রমাণের জন্য এই দৃষ্টান্তই যথেষ্ট।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৭৬-৩৭৮)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অন্য একস্থানে বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নিষ্পাপ নবীকে নিরাপদ রাখার জন্য এক অলৌকিক নিদর্শন দেখিয়েছেন যে, যদিও শত্রুরা সেই গুহা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল যেখানে মহানবী (সা.) নিজ সাথিকে নিয়ে আত্মগোপন করেছেন, তারা তাঁকে (সা.) দেখতে পায় নি, কেননা আল্লাহ্ তা'লা একজোড়া কবুতর সেখানে প্রেরণ করেন যারা সেই রাতেই গুহার মুখে বাসা বেঁধেছিল এবং ডিমও পেড়ে রেখেছিল। একইভাবে মাকড়সা সেই গুহার মুখে খোদার নির্দেশে তার জাল বিছিয়েছিল যার ফলে শত্রুরা ধোঁকা খেয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যায়।"

(সুরমা চশম আরিয়া, রূহানী খাযায়েন, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬৬, টীকা)

আরেকটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী হযরত আবু বকর (রা.)-এর কুশলী পুত্র হযরত আব্দুল্ল হ্ বিন আবু বকর (রা.) রাতে সওর গুহায় আসতেন এবং মক্কার সারাদিনের খবরাখবর প্রদান করতেন। দিকনির্দেশনা গ্রহণ করতেন এবং ভোরবেলা এমনভাবে মক্কায় ফেরত আসতেন যেন তিনি মক্কাতেই রাত কাটিয়েছেন। একইসাথে আমের বিন ফুহায়রার বুদ্ধিদীপ্ততা দেখুন! তিনি রাতের বেলা দুধেল বকরিগুলোর দুধ প্রদানের পর ছাগপাল এমনভাবে ফেরত আনতেন যার মাধ্যমে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবু বকর (রা.)-এর পদচিহ্নও সাথে সাথে মুছে দেওয়া হতো।

(সহী বুখারী, কিতাবু মানাকিবুল আনসার, বাব হিজরাতু নবী, হাদীস-৩৯০৫) (আসসীরাতুন নাবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ২৮৯)

কতিপয় জীবনীকার এটিও বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আসমা (রা.) প্রতিদিন খাবার নিয়ে আসতেন। (আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড,পৃ:৫৪)

কিন্তু এটি অসম্ভব। কতকের সঠিক মতামত হলো, এই বিপদসঙ্কুল অবস্থায় একজন নারীর প্রতিদিন এখানে আসা গোপনীয়তা প্রকাশের নামান্তর আর যেখানে আব্দুল্লাহ্ বিন আবু বকর (রা.) প্রতিদিনই আসতেন সেখানে হযরত আসমা (রা.)-এর খাবার আনার কী প্রয়োজন থাকতে পারে? যাহোক আল্লাহ্ ভালো জানেন। কিন্তু তিন দিন এভাবে অতিবাহিত হয়। মক্কাবাসীরা যখন নিকটবর্তী স্থানগুলো সন্ধান করে (তাঁকে খুঁজে বের করতে) ব্যর্থ হয় তখন তারা পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে অনেক বড় একটি পুরস্কারের ঘোষণাসহ আশেপাশের জনপদগুলোতে ঘোষক প্রেরণ করে যারা ঘোষণা করছিল, মুহাম্মদ (সা.)কে জীবিত অথবা মৃত ধরে আনতে পারলে একশ উট পুরস্কার দেওয়া হবে। এত বড় পুরস্কারের লালসা অনেক লোককে মহানবী (সা.)-এর খোঁজে বের হতে পুনরায় উদ্যমী করে তুলে।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড,পৃ:৫৮)

অপরদিকে তিনদিন পূর্ণ হওয়ার পর কথামত আব্দুল্লাহ্ বিন উরায়কেত উট নিয়ে আসে। সহীহ্ বুখারীর একটি হাদীসে উল্লেখ আছে, আব্দুল্লাহ্ বিন উরায়কেতের কাছ থেকে এই অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল যে, তিন দিন পর সকালে সে উট নিয়ে পৌঁছে যাবে।

(আসসীরাতুন নাবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৩৪৪) (সহী বুখারী, কিতাবু মানাকিবুল আনসার, হাদীস-৩৯০৫) (ফাতহুল বারী শারাহ বুখারী, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৩৮)

এই রেওয়ায়েত থেকে এ ধারণা পাওয়া যায় যে, সওর গুহা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে সকালে যাত্রা করা হয়েছিল। কিন্তু বুখারী শরীফেরই অন্য একটি রেওয়ায়েতে এই ব্যাখ্যা রয়েছে যে, সফরটি রাতে শুরু হয়েছিল। যেমন হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব আব্দুল্লাহ্ বিন উরায়কেতের উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন, মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) আগে থেকেই তাকে নিজেদের উটনী দিয়ে রেখেছিলেন এবং তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিন রাত অতিবাহিত হওয়ার পর তৃতীয় দিন সকালে তুমি উটনীগুলো নিয়ে সওর গুহায় পৌঁছে যাবে। অতএব সে চুক্তি অনুসারে পৌঁছে যায়। এটি বুখারী শরীফের প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েত। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা লিখেছেন, মহানবী (সা.) রাতের বেলা রওয়ানা হয়েছিলেন আর বুখারী শরীফেরই অন্য একটি রেওয়ায়েতে এর সত্যায়ন পাওয়া যায়। এছাড়া এটিই অনুমেয় বিষয় যে, তিনি (সা.) নিশ্চয় রাতের বেলায় যাত্রা করেছিলেন।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ২৩৯-২৪০)

মহানবী (সা.) পয়লা রবিউল আউয়াল সোমবার রাতে গুহা থেকে বের হয়ে যাত্রা করেন। ইবনে সা'দ-এর মতে তিনি (সা.) ৪ রবিউল আউয়াল সোমবার রাতে গুহা থেকে যাত্রা করেন।

(তারিখুল খামস, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৮)

প্রথমটি তারিখুল খামিসের বর্ণনা। সহীহ্ বুখারীর ব্যাখ্যাকারী আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী লিখেন, ইমাম হাকেম বলেন, এ সম্পর্কে মুতাওয়াতের (বহু নীর্ভরযোগ্য উৎস থেকে বর্ণিত) মত হল, হুযূর (সা.)-এর মক্কা থেকে যাত্রা করার দিনটি সোমবার ছিল এবং মদীনায় প্রবেশের দিনটিও সোমবার ছিল। কিন্তু মুহাম্মদ বিন মূসা খাওয়ারযমি ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) মক্কা থেকে বৃহস্পতিবার যাত্রা করেন। আল্লামা ইবনে হাজর এসব রেওয়ায়েের মধ্যে সমন্বয় করতে গিয়ে লিখেন, রসূল করীম (সা.) মক্কা থেকে বৃহস্পতিবারই যাত্রা করেছিলেন কিন্তু গুহায় শুক্র, শনি ও রবিবার- এই তিন রাত অবস্থান করার পর সোমবার রাতে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

(ফাতহুল বারী, শারাহুল বুখারী লি ইবনে হাজার, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৯৯)

মহানবী (সা.) কাসওয়া নামের একটি উটনীতে আরোহণ করেন। হযরত আবু বকর (রা.) তার উটনীতে নিজের সাথে আমের বিন ফুহায়রাকে উঠিয়ে নেন এবং উরায়কেত তার উটে আরোহণ করে। হযরত আবু বকর (রা.)-এর বাড়িতে সব মিলে পাঁচ বা ছয় হাজার দিরহাম জমা ছিল তা-ও তিনি সাথে নিয়ে নেন। কতিপয় রেওয়ায়েত অনুসারে আমের বিন ফুহায়রা এবং হযরত আসমা (রা.) খাবার নিয়ে আসেন যাতে ছাগলের কসা মাংস ছিল কিন্তু এখানে পৌঁছার পর দেখেন যে, খাবার এবং মশক বাঁধার জন্য কোন কাপড় নেই। তখন হযরত আসমা (রা.) তাঁর নিতাক বা কমর বন্ধনী খুলে তা দুই ভাগ করেন আর এরপর একটি দিয়ে খাবার এবং একটি দিয়ে মশকের মুখ বাঁধেন। মহানবী (সা.) হযরত আসমা (রা.)কে জান্নাতে দুটি নিতাকের সুসংবাদ দেওয়ার পর তাদের সবাইকে বিদায় জানান এবং এই দোয়া করতে করতে সফর শুরু করেন যে, আল্লাহুম্মাসাহাবনি ফি সাফারি ওয়াখলু ফনি ফি আহলী, অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমার সফরে তুমি আমার সাথি হও এবং (আমার অবর্ত মানে) আমার পরিবারে তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাও।

(মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ্ ওয়াল্লাযীনা মাআহু, প্রণেতা-আব্দুল হামীদ জাওদাতুস সাহাজর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬১) (আসসীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৩৪৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরূত, ২০০১)

যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, কমরবন্ধনী দিয়ে খাবার বাঁধার ঘটনা হযরত আবু বকর (রা.)-এর ঘর থেকে যাত্রা করার সময় ঘটেছিল। কিন্তু যাহোক, এখানেও এর উল্লেখ পাওয়া যায় অর্থাৎ ইতিহাসে এ ঘটনাটি দু'টি উপলক্ষ্যে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। কারো কারো মতে, মহানবী (সা.) যখন হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কায় হযরত আবু বকর (রা.)-এর ঘর থেকে সওর গুহা অভিমুখে যাত্রা করছিলেন সেসময়কার ঘটনা আবার কারো কারো মতে এটি তখনকার ঘটনা যখন মহানবী (সা.) সওর গুহা থেকে মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করছিলেন। যাহোক, এই উভয় রেওয়ায়েতই বিদ্যমান। কিন্তু বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা.) হিজরতের সফরের যে বৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন সেই রেওয়ায়েতের ধারাবাহিকতা অনুসারে এটাই বুঝা যায় যে, এটি হযরত আবু বকর (রা.)-এর ঘর থেকে যাত্রা করার সময়কার ঘটনা। তাই, বুখারীর রেওয়ায়েতকে প্রাধান্য দেওয়াই অধিক সমীচীন হবে কেননা, প্রথমতঃ সওর গুহায় অবস্থান করাকে যেভাবে গোপনীয় রাখা হয়েছে সেক্ষেত্রে হযরত আসমা (রা.)-এর সেখানে খাবার নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি প্রশ্নের উর্ধ্বে নয়। যেখানে দু'জন পুরুষ হযরত আবদুল্লাহ বিন আবি বকর ও আমির বিন ফোহায়রা প্রতিদিন সংগোপনে যাতায়াত করতেন সেখানে এ মহিলার যাওয়া নিরাপত্তা ও সাবধানতার দাবির পরিপন্থী মনে হয়। তাই নিজ ঘরেও কমরবন্ধনী দিয়ে খাবার বেঁধে দেওয়ার যে ঘটনা রয়েছে তাতে হযরত আসমা (রা.)-এর আত্মনিবেদন ও গভীর ভালোবাসার ঝলকই প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ সেসময় খাবার বাঁধার জন্য অন্য কোন জিনিস খুঁজে সময় নষ্ট করার পরিবর্তে (গুহার ক্ষেত্রে হয়ত একথা বলা যায় যে, এটি যেহেতু গুহার ঘটনা তাই সেখানে অন্য কোন জিনিষ ছিল না। কিন্তু এঘটনা ঘরেও হতে পারে যে, তাৎক্ষণিকভাবে বাঁধার জন্য কোন জিনিস পাওয়া যায় নি আর সময় নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা ছিল তাই) নিজের

কমরবন্ধনী খুলে খাবার বেঁধে দিয়ে হযরত আবু বকর ও মহানবী (সা.)-কে তিনি বিদায় দেন। তাই, বুখারীর রেওয়ায়েত অনুসারে, এটিই অধিক সঠিক বলে মনে হয় যে, খাবার বেঁধে দেওয়ার ঘটনা হযরত আবু বকর (রা.)-এর ঘর থেকে বিদায় নেওয়ার সময় সংঘটিত হয়ে থাকবে, সওর গুহা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রার প্রাক্কালের ঘটনা নয়। যাহোক, আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

হযরত আসমা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) যখন হিজরতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তখন হযরত আবু বকর তাঁর সব ধন-সম্পদ সাথে নিয়ে নেন যার পরিমাণ পাঁচ বা ছয় হাজার দিরহাম ছিল।

তিনি বর্ণনা করেন, আমাদের দাদাজান আবু কুহাফা আমাদের কাছে আসেন, এরপূর্বে ই তাঁর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গিয়েছিল। তিনি এসে বলেন, আল্লাহর কসম! আমি মনে করি, সে অর্থাৎ হযরত আবু বকর নিজ জীবনের পাশাপাশি তার ধন-সম্পদের মাধ্যমে তোমাদেরকেও বিপদে ফেলে গেছে। একথা শুনে হযরত আসমা (রা.) বলেন, না, দাদাজান! কক্ষনো না, তিনি তো আমাদের জন্য অনেক সম্পদ রেখে গেছেন। তিনি বলেন, এরপর আমি কিছু পাথর নিয়ে সেগুলোকে ঘরের ঘুলঘুলিতে রেখে দিই যেখানে আমার পিতা টাকা পয়সা রাখতেন। এরপর সেগুলোকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিই এবং দাদাজানের হাত ধরে আমি বলি, দাদাজান! এই সম্পদের ওপর নিজের হাত রেখে তো দেখুন। তিনি সেগুলোর ওপর নিজ হাত রেখে বলেন, ঠিক আছে কোন সমস্যা নেই, সে যদি তোমাদের জন্য এত অর্থ রেখে গিয়ে তাকে তাহলে সে ভালোই করেছে। হযরত আসমা বলেন, আল্লাহর কসম হযরত আবু বকর (রা.) আমাদের জন্য কিছুই রেখে যান নি কিন্তু আমি সেই বয়োবৃদ্ধকে এভাবে আশ্বস্ত করার ইচ্ছা করলাম।

(আসসীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৩৪৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত, ২০০১)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব সওর গুহা থেকে যাত্রার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, "সওর গুহা থেকে বের হয়ে তিনি একটি উটনিতে চড়ে বসেন যার নাম কতিপয় রেওয়ায়েতে কাসওয়া বর্ণিত হয়েছে। আর অপর উটনিতে হযরত আবু বকর (রা.) এবং তার সেবক আমের বিন ফুহায়রা বসেন। যাত্রার প্র াক্কালে তিনি মক্কার দিকে শেষবারের মত ফিরে তাকান এবং আক্ষেপের সাথে বলেন, হে মক্কা নগরী! সকল স্থানের মাঝে তুমি আমার সবচেয়ে প্রিয় কিন্তু তোমার অধিবাসীরা আমাকে এখানে থাকতে দিল না। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, এরা নিজেদের নবীকে বহিস্কার করেছে এখন নিশ্চয় এরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।" (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ২৪০)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "দু'দিন সেই গুহাতেই অপেক্ষা করার পর পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী রাতের বেলা গুহার কাছে বাহন নিয়ে আসা হয় এবং দু'টি দ্রুতগামী উটনিতে চড়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সঙ্গীরা যাত্রা করেন। একটি উটনির ওপর চড়েন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং পথপ্রদর্শক (গাইড) অর্থাৎ এরূপ একটি বর্ণনাও আছে যে, উভয়ে একই বাহনে চড়েছিলেন, অপর এক বর্ণনামতে উটনি ছিল তিনটি। যা-ই হোক, দ্বিতীয় উটনিতে চড়েন হযরত আবু বকর (রা.) ও তার কর্মচারী আমের বিন ফুহায়রা। মদীনা অভিমুখে যাত্রা করার পূর্বে রসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কার দিকে মুখ তুলে তাকান; সেই পবিত্র নগরীর দিকে যেখানে তিনি (সা.) জন্মগ্রহণ করেছেন, যেখানে তিনি (সা.) নবুওয়প্রাপ্ত হয়েছেন এবং যেখানে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর যুগ থেকে তাঁর (সা.) পিতৃ পুরুষ বসবাস করে আসছিলেন। তিনি (সা.) শেষবারের মত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং আক্ষেপের সাথে সেই নগরীকে সম্বোধন করে বলেন, হে মক্কা নগরী! তুমি আমার কাছে সকল স্থানের চেয়ে অধিক প্রিয়! কিন্তু তোমার বাসিন্দারা আমাকে এখানে থাকতে দিল না! সেসময় আবু বকর (রা.)-ও অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলেন, এরা নিজেদের নবীকে বের করে দিল, এখন তো এরা নিশ্চিত ধ্বংস হয়ে যাবে!"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ২২৩-২২৪) (আসসীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৩৪৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত, ২০০১) এক রেওয়ায়েত অনুসারে যখন তারা জুহফা নামক স্থানে পৌঁছেন, [জুহফা মক্কা থেকে প্রায় ৮২ মাইল দূরে অবস্থিত;] তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়: إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই যিনি তোমার ওপর কুরআন ফরয করেছেন, তিনি অবশ্যই তোমাকে এক প্রত্যাবর্তনস্থলে ফিরিয়ে আনবেন।'

(মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ্ ওয়াল্লাযীনা মাআহু, প্রণেতা-আব্দুল হামীদ জাওদাতুস সাহাজর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬৪) (শারাহ যারকানি আলা মোয়াহিবুল লাদানিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৭২)

এই পথচলা সারারাত চলতে থাকে; পথ চলতে চলতে যখন প্রায় দুপুর হওয়ার উপক্রম, তখন কাফেলা একটি পাথরের ছায়ায় বিশ্রাম নেওয়ার জন্য থামে। হযরত আবু বকর বিছানা বিছিয়ে দেন এবং মহানবী (সা.)-কে বিশ্রাম নিতে অনুরোধ করেন। তাই মহানবী (সা.) শুয়ে পড়েন। হযরত আবু বকর তখন এটি দেখতে বেরিয়ে পড়েন- কেউ পিছু ধাওয়া করে আসছে না -তো! ততক্ষণে দূর থেকে ছায়ার সন্ধানে এক রাখাল ছাগপাল নিয়ে সেখানে এসে হাজির হয়। হযরত আবু বকর বলেন, "আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, 'ছেলে, তুমি কার কর্মচারী?' সে বলে, 'কুরাইশের এক ব্যক্তির'; সে তার নাম বললে আমি তাকে চিনতে পারি। আমি বলি, 'তোমার ছাগপালে কি একটু দুধ হবে?' সে বলে, 'হ্যাঁ।' আমি জিজ্ঞেস করি, 'তুমি কি আমাদের জন্য একটু দুধ দোহন করতে পারবে?' সে বলে, 'হ্যাঁ।' সুতরাং আমি তাকে দুধ দোহন করতে বলি। সে তার ছাগলগুলো থেকে একটি ছাগলের পা নিজের গোছা ও রানের ভাঁজে চেপে ধরে, আর আমি তাকে বলি, 'প্রথমে ওলান ভালভাবে পরিষ্কার করে নাও।' তারপর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দুধ পাত্রে ঢেলে নিই।" তাতে পানি ঢালি যেন দুধের তাপমাত্রা একটু কমে যায় এবং দুধ মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করি। কতিপয় রেওয়ায়েতে রয়েছে, যখন হযরত আবু বকর দুধ নিয়ে উপস্থিত হন, তখনও মহানবী (সা.) ঘুমিয়ে ছিলেন; হযরত আবু বকর তাঁর (সা.) বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটানো সমীচীন মনে করেন নি, তাই তাঁর (সা.) জেগে ওঠার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। জেগে ওঠার পর তিনি দুধ উপস্থাপন করেন এবং নিবেদন করেন, 'হে আল্লাহ্ র রসুল! পান করুন।' হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, 'তিনি (সা.) এতটা পান করলেন (যা দেখে) আমি আনন্দিত হলাম। এরপর আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসুল, যাত্রা করার সময় হয়েছে।' তিনি (সা.) বলেন, 'হ্যাঁ'। অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) নিজেই বলেন, 'এখন পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করা যাক।' তিনি (রা.) নিবেদন করেন, 'জ্বি, আমার মনীব!' অতঃপর পুনরায় যাত্রা আরম্ভ হয়।

(সহী বুখারী, কিতাবু ফাযাইলি আসহাব, হাদীস-৩৬৫২)(সুবালুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৩য় খণ্ড,পৃ: ২৪৩-২৪৪)

সুরাকা বিন মালেকের পশ্চাদ্ধাবনের ঘটনা এরূপ: উরায়কিতের মত দক্ষ গাইডের তত্ত্বাবধানে সমুদ্রতীরবর্তী জনপদগুলোর দিক দিয়ে মদীনা অভিমুখে এই যাত্রা আরম্ভ করা হয়েছিল, যা মদীনা যাবার মূল পথের চেয়ে ভিন্ন ছিল। মক্কা এবং এর আশপাশের জনবসতিগুলোতে একশ উট পুরস্কারের সাধারণ ঘোষণা দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। অনেকেই এই মূল্যবান পুরস্কার লাভের বাসনা রাখত। সুরাকা বিন মালিক যিনি পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন আর ইসলাম গ্রহণের পর তিনি নিজেই ঘটনাটি বর্ণনা করেন যে, কাফের কুরাইশের দূত আমাদের কাছে আসে। তারা মহানবী (সা.) এবং আবু বকর (রা.) উভয়কে যারা হত্যা করবে অথবা জীবিত বন্দী করবে তাদের জন্য পুরস্কার নির্ধারণ করে রেখেছিল।

সুরাকা বলেন, আমি আমার বংশ বনু মাদলাজের একটি মজলিসে বসে ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি তাদের সামনে দিয়ে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াল। সে বলল, হে সুরাকা! আমি উপকূলীয় অঞ্চলে ছায়ার মত কিছু দেখেছি বা বলে যে, তিন জনের একটি কাফেলা চলে যেতে দেখেছি এবং আমি মনে করি এটা মুহাম্মদ-ই (সা.)। সুরাকা বিন মালেক বলল, আমি বুঝে গেছি যে, এটি অবশ্যই মুহাম্মদের কাফেলাই হবে কিন্তু আমি চাইতাম না যে, এই পুরস্কারে আমার সাথে অন্য কেউ ভাগ বসাক। আমি দ্রুত পরিস্থিতির স্পর্শ কাতরতা নিয়ন্ত্রণ করলাম এবং তথ্যদাতাকে চোখের ইশারায় চুপ থাকার ইঙ্গিত দিলাম এবং আমি নিজেই বললাম, না- এটা মুহাম্মদের কাফেলা হতে পারে না, বরং তুমি যাদের কথা বলছ তারা তো এখনই আমাদের সামনে দিয়ে চলে গেছে, তারা তো অমুক গোত্রের লোক যারা হারিয়ে যাওয়া উটনির সন্ধানে যাচ্ছিল। সুরাকা বলে, আমি এই বৈঠকে কিছুক্ষণ বসে থাকলাম যাতে কারও কোন সন্দেহ না হয় এবং তারপর আমি আমার একজন দাসীকে বললাম আমার দ্রুতগামী ঘোড়াটি নিয়ে বাড়ির পেছনে অমুক স্থানে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ যেন আমার জন্য অপেক্ষা করে। কিছুক্ষণ পর তিনি নিজেই সেখানে পৌঁছেন। বর্ণনা করেন যে, আমি একটি ভাগ্য নির্ধারণী লটারী করি কিন্তু তা এই যাত্রার বিপক্ষে যায়। আমি তার পরওয়া করি নি আর ঘোড়ার গায়ে গোড়ালি মেরে অদৃশ্য হয়ে যায় আর দ্রুত গতিতে সেই কাফেলার পিছু ধাওয়া করতে থাকি। আমার ধারণা অনুসারে এটি মুহাম্মদ (সা.)-এরই কাফেলা ছিল। সুরাকা বলেন একের পর এক মাইল ফলক অতিক্রম করে আমি শীঘ্রই কাফেলার কাছে গিয়ে পৌছাই। তাদের অদূরেই আমার ঘোড়া অস্বাভাবিকভাবে হোঁচট খায় আর আমি ঘোড়া থেকে পড়ে যাই। অতঃপর আমি উঠে দাঁড়াই এবং ভাগ্য নির্ধারণী লটারী করি এবং লটারী আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যায় কিন্তু আমি মুহাম্মাদ (সা.)-কে ফিরিয়ে নিয়ে একশত উটের পুরস্কার পেতে চাই। অতঃপর আমি উঠে আবার ঘোড়ায় চড়ি এবং তখন আমি এত কাছে ছিলাম যে, আমি চিনতে পারলাম যে, এটি মুহাম্মদ ও আবু বকরই ছিল বরং আমি মহানবী (সা.)-এর কিছু একটা পাঠ করার শব্দ শুনতে পাই। তখনই আমার ঘোড়া মারাত্মকভাবে হোঁচট খায় এবং তার পা বালিতে আটকে যায় আর আমি পড়ে যাই। তারপর আমি ঘোড়াটিকে ধমক দিয়ে উঠে দাঁড়াই, অর্থাৎ ভর্ৎসনা করি, তখন সে উঠে দাঁড়ায় কিন্তু ঘোড়া মাটি থেকে নিজের পা বের করতে পারছিল না। অবশেষে, যখন সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তখন তার পা থেকে ধুলা বাতাসে ধোঁয়ার মত ছড়িয়ে পড়ে। এতটাই ঢুকে ছিল যে যখন পা

বের করল তখন মাটি অথবা বালী থেকে ধুলা উড়া শুরু করল। সে বলে যে, এখন আমি আবার তীর দ্বারা শুভাশুভ নির্ণয় করলাম, তাই বের হলো যা আমার পছন্দ হয় নি। আমি সেখান থেকে শান্তির আহ্বান জানিয়ে তাদেরকে ডেকে বললাম, আমি আপনাদের কোন ক্ষতি করব না। এতে মহানবী (সা.) আবু বকর (রা.) কে বললেন, তাকে জিজ্ঞেস কর যে, সে কি চায়। সে বলল, আমি সুরাকা আমি আপনাদের সাথে কথা বলতে চাই। এতে তারা থামলো। সুরাকা বলতে লাগল, মক্কাবাসীরা তাঁকে {অর্থাৎ মহানবী (সা.) কে} জীবিত অথবা মৃত ধরে আনার জন্য একশত উটের পুরস্কার নির্ধারণ করেছে এবং আমি এই লোভে আপনাদের পিছু ধাওয়া করে এসেছি, কিন্তু আমার সাথে যা ঘটেছে তাতে আমি নিশ্চিত যে আমার এই পিছু ধাওয়া করা সঠিক নয়। সে মহানবী (সা.)-এর খিদমতে পাথেয় ইত্যাদি পেশ করে কিন্তু মহানবী (সা.) তা গ্রহণ করেন নি। তিনি শুধু এতটুকু বলেন যে, আমাদের সম্পর্কে কাউকে কিছু বলবে না। সে এই অঙ্গীকার করে আর একইসাথে এই নিবেদনও করে যে, আমার বিশ্বাস হলো আপনি একদিন রাজত্ব লাভ করবেন। আমাকে কোন অঙ্গীকারপত্র লিখে দিন যে, তখন আমি আপনার সমীপে উপস্থিত হলে আমার সাথে যেন সম্মান ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করা হয়। কোন কোন রেওয়ায়েত অনুযায়ী সে নিরাপত্তাপত্র লিখে দেওয়ার অনুরোধ করেছিল। অতএব মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে হযরত আবু বকর এবং আরেক রেওয়ায়েত অনুযায়ী আমের বিন ফুহায়রা তাকে সেই পত্র লিখে দেন আর সে উক্ত পত্র নিয়ে ফিরে আসে।

(সহী বুখারী, কিতাবু ফাযাইলি আসহাব, হাদীস-৩৯০৬)(সুবালুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৪৮)(মহম্মদ রসুলুল্লাহ ওয়াল্লাযীনা মাআহু, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬৪-৬৫)

এই স্মৃতিচারণ এখন ইনশাআল্লাহ্ আগামীতেও অব্যাহত থাকবে।

আগামীকাল ইনশাআল্লাহ্ নতুন বছরও আরম্ভ হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা এই নববর্ষ জামা'তের সদস্যদের জন্য এবং জামা'তের জন্য সমষ্টিগতভাবে সকল দিক থেকে কল্যাণমণ্ডিত করুন। সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে জামা'তকে সুরক্ষিত রাখুন। আর জামা'তের বিরুদ্ধে শত্রুদের যত ষড়যন্ত্র রয়েছে, সকল ষড়যন্ত্রকে ধূলিসাৎ করুন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তা'লার যেসব প্রতিশ্রুতি রয়েছে সেসব প্রতিশ্রুতি যেন আমরাও নিজেদের জীবনে অধিক হারে পূর্ণ হতে দেখতে পাই। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেই দৃশ্যও দেখান। অতএব অধিক হারে দোয়া করুন।

নতুন বছরে দোয়ার সাথে প্রবেশ করুন। তাহাজ্জুদের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। কোন কোন মসজিদে হচ্ছেও বটে, বাকি যেখানে ব্যবস্থা নেই সেখানেও (আয়োজন) করা উচিত। যদি বাজামা'ত না হয় তাহলে ব্যক্তিগতভাবেও এবং ঘরেও তাহাজ্জুদ নামায আদায় করা উচিত এবং দোয়া করা উচিত। প্রথমত এটি স্থায়ী অভ্যাস হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু আগামীকাল থেকে বা আজ রাত থেকে যখন পড়বেন তখন চেষ্টা করুন যেন এটি জীবনের স্থায়ী অংশে পরিণত হয়। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে সেই তৌফিকও দান করুন।

দরূদ শরীফ এবং ইস্তেগফার ছাড়া এই দোয়াগুলোও অধিক হারে পাঠ করুন। رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ। অর্থাৎ, 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে হেদায়েত দানের পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি কৃপা কর, নিশ্চয় তুমি মহান দাতা' (সূরা আলে ইমরান: ০৯)। অতঃপর এই দোয়াও পাঠ করুন যে, رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ অর্থাৎ 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের পাপ ও নিজেদের কর্মকাণ্ডে আমাদের সীমালঙ্ঘন ক্ষমা কর এবং আমাদের অবস্থানকে সুদৃঢ় কর, আর অস্বীকারকারী জাতির বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর' (সূরা আলে ইমরান: ১৪৮)। আল্লাহ্ তা'লা সকল আহমদীকে এই তৌফিক দান করুন।

এখন আমি জুমুআর নামাযের পর কয়েক জনের গায়েবানা জানাযাও পড়াব। তাদেরও স্মৃতিচারণ করতে চাই। প্রথম স্মৃতিচারণ হলো মোকাররম মালেক ফারুক আহমদ খোখার সাহেবের, তিনি মুলতান জেলার আমীর ছিলেন। ১৮ ডিসেম্বর তারিখে ৮০ বছর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ-। তার পিতা ছিলেন মোকাররম মালেক উমর আলী খোখার সাহেব, যাকে মুলতানের রঈস বলা হতো। আর মাতা ছিলেন সৈয়্যদা নুসরাত জাহাঁ বেগম সাহেবা। তিনি সৈয়্যদা বেগম নামে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি হযরত মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেবের কন্যা ছিলেন। হযরত মালেক উমর আলী সাহেব আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন নিজের যৌবনকালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর খিলাফতকালে। কাদিয়ান গিয়ে তিনি বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। মালেক উমর আলী সাহেবের মৃত্যু স্বল্প বয়সে হয়ে যায়। তখন মালেক ফারুক আহমদ সাহেবের বয়স প্রায় ২২ বছর ছিল, অর্থাৎ তিনি প্রায় যুবকই ছিলেন। করাচীতে মালেক সাহেবের জমিজমার পাশাপাশি কিছু ব্যবসা ছিল। সেটি তিনি খুবই উত্তমরূপে সামলান। তার দুজন মাতা ছিলেন। ভাইবোনদের উত্তমভাবে লালনপালন করেন। মালেক ফারুক খোখার সাহেব দীর্ঘকাল খোদ্দামুল আহমদীয়া মুলতানের জেলা কায়েদ এবং এরপর মুলতানের আঞ্চলিককায়েদ হিসেবে সেবা করেছেন। ১৯৮০ থেকে ৮৫ সন পর্যন্ত মুলতান জেলার আমীর হিসেবে সেবা করার সুযোগ লাভ করেছেন। সেই সময় মুলতান শহরের আমীর হিসেবেও তিনি সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। তার বিয়ে হয়েছিল ১৯৬৮ সনে হযরত মির্যা আযীয আহমদ সাহেবের কন্যা দুরদানা সাহেবার সাথে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বিয়ে পড়িয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে এক পুত্র এবং পাঁচ কন্যা দান করেছেন।

তার স্ত্রী বলেন, মরহুম খুবই স্নেহশীল এবং যত্নবান ছিলেন। তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়াদিরও খেয়াল রাখতেন। রীতিমতো তাহাজ্জুদ পড়তেন আর আমাকেও প্রতিদিন তাহাজ্জুদের জন্য জাগাতেন। যেদিন মৃত্যু বরণ করেছেন সেদিনও নফল পড়েন, নামায আদায় করেন এবং এরপর ঘুমিয়ে পড়েন। সর্বদা ওযুতে থাকার চেষ্টা করতেন। তিনি বলেন, যখন জামা'তের আমীর ছিলেন না তখনও কোন আহমদীর কোন সমস্যা হলে, যে কোন সময় কারো কোন ফোন আসলে তাৎক্ষণিকভাবে কাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতেন। যখন জামা'তের আমীর হয়েছেন তখন আমার জন্য এই নির্দেশ ছিল যে, সর্বদা খাবার এবং চায়ের আয়োজন প্রস্তু ত থাকা চাই, যেকোন সময় কোন অতিথির আগমন হতে পারে। তিনি বলেন, আমার মনে পড়ে না যে, আমার ঘর কখনো অতিথিশূন্য ছিল বা কেউ না কেউ স্থায়ীভাবে অবস্থান করতো না। কতিপয় মুরব্বীকেও নিজের ঘরে থাকার সুযোগ করে দিতেন। তার ঘরও অফিস হিসেবেই ব্যবহৃত হতো। অনেক উদার মনের অধিকারী ছিলেন এবং আন্তরিকভাবে ভালোবাসতেন। সকল অআহমদী আত্মীয়, বরং পুরো খোখার পরিবার তাকে অনেক সম্মান এবং শ্রদ্ধা করত, ভালোবাসতো। তিনি সর্বদা সবার সাথে আন্তরিকভাবে সম্পর্ক রক্ষা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তাঁর তিলাওয়াত খুবই সুন্দর ছিল। তিনি বলেন, আমি যখন তিলাওয়াত করতাম তখন পবিত্র কুরআন না খুলেই আমার তিলাওয়াতের সংশোধন করে দিতেন। তার পুত্র তালহা বলেন, নিজের উভয় মায়ের খুবই খেয়াল রাখেন এবং কখনো কোন পার্থ ক্য করেন নি আর নিজের সকল ভাইবোনের বিয়েও নিজেই করিয়েছেন। তার ঘরও তার হৃদয়ের ন্যায় সবার জন্য সর্বদা খোলা ছিল, বিশেষত জামা'তের ওয়াকফে জিন্দেগীদের জন্য। মারির খায়রা গলিতে তার একটি ঘর ছিল। তিনি বলতেন যে, এটিতো আমি জামা'তের জন্যই বানিয়েছি। কখনো কাউকে মানা করেন নি, যে-ই সেখানে গিয়ে থাকতে চাইতো থাকতে পারতো। ১৯৮৪ সনের অর্ডিন্যান্সোত্তর পরীক্ষার যুগে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায়, নিজের সাহসী ব্যক্তিত্বে র দ্বারা মুলতান জেলা এবং শহরের সকল সঙ্গীকে সর্বদা সাহস যুগিয়েছেন, তাদেরকে কখনো দুর্বল হতে দেন নি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর হিজরতের সফরে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি হুযূরের কাফেলায় অন্ত র্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এছাড়া এক স্থানে কাফেলাকে তিনি নেতৃত্বও দিয়েছেন। তার পুত্র লিখেন যে, আব্বার এমারতকালে আমাদের ঘর, ঘরের চেয়ে বেশি অফিস ছিল, খুবই কর্মচঞ্চল থাকত। জমিজমার কাজ তিনি নিজের ছোট ভাইয়ের দায়িত্বে দিয়ে দেন আর নিজের পুরো সময় ধর্মের জন্য উৎসর্গ করে দেন। সবাই অকৃত্রিমভাবে আসতো, অকৃত্রিম প্রকৃতির অধিকারী ছিলেন। অ-আহমদী আত্মীয়স্বজনদের আর্থি ক সাহায্যও করতেন। তিনি বলেন, তার জানাযায় আমাদের কতিপয় আত্মীয়স্বজন আসেন এবং কাঁদতে কাঁদতে বলেন, আজ আমরা এতিম হয়ে গেছি, কেননা তিনি তাদের সাহায্য সহযোগিতা করতেন। তিনি বলেন, সর্বদা আমাদেরকে নামাযের বিষয়ে নসীহত করতেন, বিশেষত ফজরের নামাযের জন্য। তার ছোট কন্যা ফায়যা বলেন, আব্বার আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভরসা আমাদের জন্য এক আদর্শ ছিল। সব ধরনের সময় দেখেছেন। যৌবনে এতিম হয়েছেন। সর্বপ্রকার অবস্থা দেখেছেন, কষ্টের যুগও এবং সাচ্ছন্দ্যের যুগও। কিন্তু শিশুকাল থেকে দেখেছি যে, আমার পিতা আল্লাহ্ তা'লার ওপর ভরসার বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন আর সর্বদা বলতেন যে, আমার সকল কাজ আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং করেন। তিনি বলেন, খিলাফতের প্রতি আব্বার অসাধারণ ভালোবাসা ছিল আর খিলাফতের কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলতেন। একটি পরীক্ষারও তিনি সম্মুখীন হয়েছেন এবং সেটিও তিনি খুবই ধৈর্য এবং দোয়ার সাথে অতিবাহিত করেছেন।

তার ছোট ভাই মালেক তারেক আলী খোখার, যিনি দ্বিতীয় মায়ের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি বলেন, আমার বয়স ছিল ০৯ বছর যখন আমার পিতা মৃত্যু বরণ করেন। আর আমার এই বড় ভাইজান মালেক ফারুক সাহেব ছিলেন ২২ বছরের যুবক। কিন্তু তিনি পিতার ন্যায় আমাদের দেখাশোনা করেছেন আর সারা জীবন আমাকে কখনো পিতার অভাব বুঝতে দেন নি। এরপর তিনি লিখেন, অ-আহমদী আত্মীয়-স্বজনের ওপর তার বিশেষ প্রভাব-প্রতাপ ছিল এবং তাদের প্রতি বিশেষ যত্ন বানও ছিলেন। বহু আহমদী পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করছিলেন। অনেক শিশুকে পড়ালেখার সুযোগ করে দিয়ে জীবিকা উপার্জনের যোগ্য করে তুলেছেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমার ভাই প্রত্যেক অভাবী-অসহায়কে ঋণ প্রদান

এরপর ৯এর পাতায়....

এরপর হুযুর আনোয়ার ভাষণ প্রদান করেন।

তাশাহুদ, তাউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার বলেন:আজ কাদিয়ানের জলসা সালানার শেষ অধিবেশন। অনুরূপভাবে আফ্রিকার একটি দেশ গিনি বাসাও, সেখানেও জলসা হচ্ছে। তারাও অনুরোধ করেছেন যেন তাদেরকে এর সঙ্গে যুক্ত করে নেওয়া হয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আরও অনেক দেশে জলসা হবে এবং হচ্ছে। যাইহোক কাদিয়ান জলসার সঙ্গে যেহেতু তাদের জলসাও ছিল, তাই তাদের কথা উল্লেখ করলাম।

হুযুর বলেন: আমাদের দাবি হল, ইসলামের শিক্ষা নিজের প্রকৃত অবস্থায় অক্ষত থাকার কারণে এক সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছে। এটিই সেই শিক্ষা, যার পূর্ণ বাস্তবায়ন হলে খোদা তা'লার নৈকট্যও লাভ হয় আর খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের বাসনা এবং প্রচেষ্টা কারণে একজন প্রকৃত মুসলমানকে একে অপরের অধিকার প্রদানের প্রতি অনবদ্য দিক-নির্দেশনা দেয়। একে অপরের অধিকার প্রদানের বিষয়টি সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করে। বর্তমান যুগে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রসঙ্গে আলোচনা হয় যে কিভাবে তা অর্জিত হতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: কোভিড মহামারি হৃদয়ের মলিনতা দূর করতে পারে নি। আল্লাহ্ তা'লার এই সতর্কবাণী থেকে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করছে না।এই মনোভাব বজায় থাকলে অত্যন্ত ভয়ানক পরিণতি হবে। আজ আমি ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষার কয়েকটি দিক তুলে ধরব, যেগুলি বাস্তবায়িত হলে পৃথিবী শান্তি ও নিরাপত্তার আবাস হতে পারে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: পৃথিবী ধর্ম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে,কিন্তু তবু এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা ধর্মের নামে অন্য ধর্মের মানুষকে আপত্তির লক্ষ্যস্থল বানাচ্ছে। ইসলাম শিক্ষা দেয়, অপরের ধর্মের প্রবর্তককে দোষারোপ করো না। ইসলামের দাবি, ইসলাম হল শেষ ধর্ম, কিন্তু একথা বলে না যে, অন্যান্য ধর্মগুলি মিথ্যা। ইসলামের দাবি, প্রত্যেক জাতিতে নবী এসেছেন। কুরআন করীমের وَاِنۡ مِّنۡ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِیۡهَا نَذِیۡرٌ আয়াতের আলোকে একজন মুসলমান হযরত ঈসা , হযরত মূসাকে কিম্বা হিন্দুদের অবতারদেরকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রত্যেক জাতিতে নবী এসেছেন। আর প্রাথমিকভাবে প্রত্যেক ধর্মের ভিত্তি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু কালের প্রবাহে সেই সব শিক্ষায় পরিবর্তন এসেছে। খোদা তা'লার কল্যাণ সর্বজনীন যা সমস্ত জাতি, দেশ এবং যুগে বিস্তৃত। যাতে কোন জাতি বা যুগ তা থেকে বঞ্চিত না থাকে। অতএব, ইসলামের শিক্ষা হল, প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদেরকে সম্মান কর, তাদের ধর্মগুরুদের সম্মান কর।

ইসলাম সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণার অবতারণা করা হয়েছে যে,ইসলাম নাকি উগ্রতা প্রিয় ধর্ম। এবং প্রাথমিক যুগে জোর করে সকলকে মুসলমান বানানো হয়েছিল। অথচ ইসলাম একথা কথা অস্বীকার করে। যেমনটি বলা হ য়ে ছে -

وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنۡ فِی
الۡاَرۡضِ کُلُّهُمۡ جَمِیۡعًا ؕ اَفَاَنۡتَ تُکۡرِهُ النَّاسَ
حَتّٰی یَکُوۡنُوۡا مُؤۡمِنِیۡنَ○(یونس:100)

অনুবাদ: এবং যদি তোমার প্রভু ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে ভূপৃষ্ঠে যত লোক আছে সকলেই ঈমান আনিত। সুতরা তুমি কি লোকদিগকে বাধ্য করিবে যে পর্যন্ত না তাহারা মো'মেন হয়।

(ইউনুস: ১০০)

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলামে প্রচার করার, সত্যের বাণী পৌঁছে দেওয়ার এবং সত্যের পথ দেখানোর আদেশ দেওয়া হয়েছে।

وَقُلِ الۡحَقُّ مِنۡ رَّبِّکُمۡ ۟ فَمَنۡ
شَآءَ فَلۡیُؤۡمِنۡ وَّمَنۡ شَآءَ فَلۡیَکۡفُرۡ ۙ

অনুবাদ: এবং তুমি বল, 'এই সত্য তোমার প্রতিপালকের তরফ হইতে (প্রেরিত), সুতরাং যাহার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যাহার ইচ্ছা অস্বীকার করুক। (আল কাহাফ: ৩০)

অতএব ইসলাম এই পৃথিবীতে অস্বীকারকারীদেরকে কোন শাস্তি দেয় না। আজও যদি মুসলমানদের কর্ম ইসলামের শিক্ষাসম্মত হয়ে যায়, তবে ইসলামের প্রতি পৃথিবীর মনোযোগ নিবদ্ধ হবে আর পৃথিবী দেখবে যে, এর দ্বারা একদিকে যেমন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে , তেমনি অপরদিকে মুসলমানদের সম্মানও প্রতিষ্ঠিত হবে।

অতঃপর পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি নীতির কথা বলা হয়েছে যে, কোন অপরাধ অপরাধ কিম্বা শত্রুতাকে ক্ষমা করে দেওয়া বা শাস্তি দেওয়া। আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

وَجَزٰٓؤُا سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِّثۡلُهَا ۚ فَمَنۡ عَفَا
وَاَصۡلَحَ فَاَجۡرُهٗ عَلَی اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا یُحِبُّ الظّٰلِمِیۡنَ

অনুবাদ: এবং (স্মরণ রাখিও যে) মন্দের প্রতিফল উহার অনুরূপ মন্দ, এবং যে ব্যক্তি ক্ষমা করে এবং সংশোধন করে তাহা পুরস্কার আল্লাহ্র জিম্মায়। আল্লাহ্ যালেমদিগকে আদৌ ভালবাসেন না। (আশ শুরা: ৪১)

অর্থাৎ সংশোধন দৃষ্টিপটে থাকা উচিত। দেখা উচিত যে শাস্তি দিলে সংশোধন হবে নাকি ক্ষমা করলে। মূল উদ্দেশ্য হবে সংশোধন করা।

হুযুর আনোয়ার বলেন: শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আঁ হযরত (সা.) আমাদেরকে এক সুবর্ণ নীতি শিক্ষা দিয়েছেন। নীতিটি হল অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত, উভয়ের প্রতি সহানুভূতি করা। এবং বলা হয়েছে যে অত্যাচারীকে অত্যাচার থেকে নিবৃত্ত করে তার প্রতি সহানুভূতি কর। এই দিকটিতে অনেক ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। অতএব, দীর্ঘস্থায়ী শান্তি তখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, যখন প্রত্যেক স্তরের ক্ষমতবান লোকেরা ভারসাম্যপূর্ণ আচরণের পন্থা অবলম্বন করবে।

এরপর রয়েছে আরও একটি অসৎ কাজ যা ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে। সেটি হল পরনিন্দা ও পরচর্চা। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, হে যারা ঈমান এনেছ! অতিরিক্ত সন্দেহ করা থেকে বিরত থাক। নিঃসন্দেহে কিছু ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সন্দেহ পাপ হিসেবে বিবেচিত হয়। এবং অতিরিক্ত অনুসন্ধিৎসু হয়ো না। তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যেন অপরের নিন্দা ও চর্চা না করে। তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কি নিজের মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ পছন্দ করবে? তোমরা এটিকে ভীষণভাবে অপছন্দ কর। এবং আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল এবং বারংবার কৃপাশীল।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: ***'ওয়ালা তা'কুল আমওয়ালাকুম বায়নাকুম বিল বাতিল'***- অর্থাৎ তোমরা নিজেদের মধ্যে নিজেদের সম্পদকে মিথ্যা ও প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎ করো না। এটি অন্যায়। এর দ্বারা বিদ্বেষ ও বিবাদের উৎপত্তি হয়। আমরা লক্ষ্য করি যে, আজকের সমাজ জাগতিকতার প্রতিযোগিতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত। প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করার চেষ্টা সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি আন্তর্জাতিক স্তরেও এই অন্যায় সংঘটিত হচ্ছে। বিত্তবান দেশগুলি বিভিন্ন অজুহাতে অন্যায়ভাবে নির্ধন দেশগুলির সম্পদ আত্মসাৎ করছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এরপর আমরা লক্ষ্য করি, কতিপয় ব্যবসাও অত্যাচারের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। ক্ষুদ্র স্তরেও আর বৃহৎ বাণিয্যের ক্ষেত্রেও। এইজন্য আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন-

وَیۡلٌ لِّلۡمُطَفِّفِیۡنَ○ الَّذِیۡنَ اِذَا اکۡتَالُوۡا
عَلَی النَّاسِ یَسۡتَوۡفُوۡنَ○

অনুবাদ: দুর্ভোগ তাহাদের জন্য যাহারা মাপে কম দেয়; যাহারা লোকদের নিকট হইতে যখন মাপিয়া গ্রহণ করে তখন পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে।

(আল মুতাফফেফীন: ২-৩)

হুযুর আনোয়ার বলেন: শান্তি ও নিরাপত্ত বিঘ্নিত করার ক্ষেত্রে অহংকারের অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। ইসলাম এটিকে কঠোরভাবে নিষেধ করে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

وَاعۡبُدُوا اللّٰهَ
وَلَا تُشۡرِکُوۡا بِهٖ شَیۡـًٔا وَّبِالۡوَالِدَیۡنِ اِحۡسَانًا
وَّبِذِی الۡقُرۡبٰی وَالۡیَتٰمٰی وَالۡمَسٰکِیۡنِ وَالۡجَارِ ذِی
الۡقُرۡبٰی وَالۡجَارِ الۡجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالۡجَنۡۢبِ
وَابۡنِ السَّبِیۡلِ ۙ وَمَا مَلَکَتۡ اَیۡمَانُکُمۡ ؕ اِنَّ
اللّٰهَ لَا یُحِبُّ مَنۡ کَانَ مُخۡتَالًا فَخُوۡرَا○

অনুবাদ: এবং তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাঁহার সহিত কোন কিছুকে শরীক করিও না এবং সদয় ব্যবহার কর- পিতামাতার সহিত এবং আত্মীয়-স্বজন এবং এতীম এবং মিসকীন এবং আত্মীয় প্রতিবেশী এবং অনাত্মীয় প্রতিবেশীগণের সহিত এবং সঙ্গী-সহচর এবং পথচারীগণের সহিত এবং তোমাদের ডান হাত যাহাদের মালিক হইয়াছে, তাহাদের সহিত। আল্লাহ্ তাহাদিগকে আদৌ ভালবাসেন না যাহারা অহংকারী, দাম্ভিক। (নিসা: ৩৭)

ক্রোধের বিষয়ে হুযুর আনোয়ার বলেন: ক্রোধ থেকে বিবাদের উৎপত্তি হয়। তিনি বলেন, বুদ্ধি ও ক্রোধজনিত উত্তেজনার মাঝে ভয়াবহ শত্রুতা রয়েছে। যে ব্যক্তিকে ক্রোধ গ্রাস করে, তার মুখ থেকে প্রজ্ঞা ও তত্ত্বজ্ঞানের কথা মোটেই বের হতে পারে না।

সূরা নহলের ৯১ নং আয়াতের আলোকে হুযুর আনোয়ার বলেন- প্রথম ধাপ হল ন্যায়ের। পরস্পরের সঙ্গে ন্যায়পূর্ণ আচরণ কর। দ্বিতীয় ধাপ হল হিতসাধন করা। ক্ষমা, অভাবপীড়িতকে সাহায্য করা, দান করা ইত্যাদি সৎকর্মগুলি এর অন্তর্ভুক্ত। এর উপরের ধাপটি হল 'ইতাযিল কুরবা', যেখানে নিকটাত্মীয়ের ন্যায় আচরণ করা হয়। যেখানে কোন ব্যক্তিস্বার্থ থাকে

৭ পাতার পর খুতবার শেষাংশ......

করতেন এবং কখনো তা ফেরত চান নি। সর্বদা করযায়ে হাসানা হিসেবে প্রদান করতেন।

অনেক নওআহমদী বলেছেন যে, আমরা আহমদীয়াত গ্রহণের পর স্বজনের মতো যত্ন নিয়ে মালেক ফারুক আহমদ খোখার সাহেবই আমাদের প্রয়োজনীয়তার প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রেখেছেন। আশি বছর বয়সে উপনীত হয়েছিলেন, কিন্তু বিগত দু'বছর যাবৎ তার হিস্যায়ে জায়েদাদ আদায়ের চিন্তা ছিল প্রবল। বেশিরভাগ অংশআদায় করেও দিয়েছেন, কিছু অংশ বাকি আছে। আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তানদেরকে বাকি অংশটুকুও আদায়ের তৌফিক দান করুন।

তার বোন তাহেরা বলেন, ইনিও দ্বিতীয় মায়ের ঘরের, আমার ভাই সর্বদা আমার সাথে একজন স্নেহশীল পিতার ন্যায় আচরণ করেছেন। সবচেয়ে বড় গুণ এটি ছিল যে, তিনি কখনো আপন ও বৈমাত্রেয়-এর পার্থক্য করেন নি। সব ভাইবোনদের সাথে সমান আচরণ করেছেন এবং উভয় মায়ের সাথেও সমান আচরণ করেছেন। আমাদের কখনো এটি অনুভব করতে দেন নি যে, আমাদের মা ভিন্ন। অতঃপর তিনি বলেন, তিনি সত্যিকার অর্থে ই আমার পিতৃস্থানীয় ছিলেন; যেভাবে এক পিতা নীরবে তার মেয়ের সুখ-দুঃখে কাজে আসে তদ্রুপ তার সাথেও আমার একই সম্পর্ক ছিল।

এরপর তার মেয়ে নমুদে সেহের বলেন, কিছু বিষয় আমার বাবার জীবনে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় এবং বার বার স্মরণ হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তার আতিথেয়তা এবং মানুষের সাথে ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক। এরপর তিনি বলেন, অতিথি আপ্যায়নের এরূপ অবস্থা ছিল যে, খাবার রান্না হয়ে যাবার পর কোন মেহমান চলে আসলে পরিবারের সদস্যরা খাবারের জন্য বসে থাকত, কিন্তু সেই খাবার বাইরে মেহমানদের জন্য পাঠিয়ে দেয়া হতো আর ঘরের সদস্যরা ডিম ভাজি করে খেয়ে নিত। এরপর বলেন, মানুষের জীবনে অনেক ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে, অবস্থায় পরিবর্তনও এসে থাকে আর এ কারণে তাকে কতিপয় পরীক্ষারও সম্মুখীন হতে হয়েছে, কিন্তু কখনো খিলাফত সম্পর্কে তিনি এমন কোন কথা বলেন নি, যদ্দারা আমাদের কখনো এই ধারণা হতে পারে যে, যুগ খলীফা ভুল সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। আমাদের ঘরে সর্বদা খুতবা শোনা এবং জামা'তের সাথে সম্পর্ক রাখার বিষয়ে বিশেষ জোর দেয়া হতো। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন। তার সন্তানদের ধৈর্য ও মনোবল দিন এবং পুণ্যের ক্ষেত্রে অগ্রগামী হওয়ার তৌফিক দান করুন।

পরবতী স্মৃতিচারণ হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া নিবাসী রহমতউল্লাহ্ সাহেবের। তিনি ৬৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ-। পূর্ব জাভায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮০ সনে ইন্দোনেশিয়া জামা'তের প্রাক্তন মুবাল্লেগ ইনচার্জ মোকাররম সুয়ুতী আযীয আহমদ সাহেবের মাধ্যমে বয়'আত করে জামাতভুক্ত হন। ১৯৯৩ সনে ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত হন। আমৃত্যু তিনি সেখানকার কেরেং নেটগা জামা'তে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও তিন সন্তান ও ছয়জন দৌহিত্র রয়েছে।

তার সহধর্মিণী লিখেন, মরহুম একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন, যাতে তিনি নিজেকে মানুষের ভিড়ে সারিতে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পান। তিনি স্বপ্নে কাউকে জিজ্ঞেস করেন যে, কোন্ সারিতে দাঁড়াব? কেউ একজন একটি সারির দিকে নির্দেশ করে যাতে একজন পবিত্র ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছিলেন। মরহুম সেই পবিত্র ব্যক্তিকে চিনতে পারেন নি। কিছুদিন পর জানা যায় যে, তিনি স্বপ্নে যে পবিত্র ব্যক্তিকে দেখেছিলেন তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ছিলেন। এজন্যই মরহুম জামা'তের সত্যতা স্বীকার করেন এবং এরপর বয়'আতও করেন। তার মেয়ে লিখেন, মরহুম বয়'আত করার পর স্থানীয় জামা'ত ছাড়াও স্থানীয় মজলিস আনসারুল্লাহ্-তে দায়িত্ব পালন করেছেন। বিরোধীদের পক্ষ হতে জামা'তের ওপর আক্রমণ এবং হুমকি-ধমকি দেওয়া হতো। মরহুম অত্যন্ত বীরত্বের সাথে জামা'তের পক্ষ হতে প্রতিরোধ করতেন। অনেক উদার ছিলেন। যখনই কেউ সাহায্যের জন্য অথবা ঋণ গ্রহণের জন্য আসতো তখন সবসময় তার সাহায্য করতেন। তার তৃতীয় মেয়ে লিখেন, মরহুম খিলাফতের প্রতি অসাধারণ ভালোবাসা রাখতেন এবং একান্ত আনুগত্যশীল ছিলেন।

ইন্দোনেশিয়ার আমীর জনাব আব্দুল বাসেত সাহেব লিখেন, মরহুম জামা'ত ও খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতেন। তিনি বলেন, সেখানকার পশ্চিম জাভার একটি শহরে আমাদের একটি জামা'ত রয়েছে। জামা'তের বিরোধীরা কয়েকবার সেখানে আমাদের মসজিদে আক্রমণ চালায় আর স্থানীয় প্রশাসনকে জামা'তের কার্যক্রমের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করার জন্য বলে। সে সময় রহমত উল্লাহ্ সাহেব অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে বিরোধী এবং স্থানীয় প্রশাসনের সম্মুখীন হন এবং তাদের আপত্তির উত্তর প্রদান করেন। মরহুমের প্রচেষ্টার কারণে সেখানে এখন পর্যন্ত জামা'ত প্রতিষ্ঠিত আছে আর কোথাও কোন বিধিনিষেধ আরোপিত হয় নি। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন। তার সন্তানদেরও তার পুণ্যসমূহ ধরে রাখার তৌফিক দিন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো কাশ্মীরের ইয়ারিপুরা নিবাসী আলহাজ্ব আব্দুল হামিদ টাক সাহেবের। তিনি গত ২৪ ডিসেম্বর তারিখে ৯৪ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ-। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওসীয়্যতকারী ছিলেন। ইয়ারিপুরা নিবাসী মুহাম্মদ আকরাম টাক সাহেবের পুত্র ছিলেন, যিনি উক্ত এলাকার প্রাথমিক আহমদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মরহুম অত্যন্ত নেক, নম্র প্রকৃতির, মিশুক, সকলের প্রিয়ভাজন, গম্ভীর ও নীরব প্রকৃতির বুযুর্গ ছিলেন। দীর্ঘকাল জামা'তের সেবা করার তৌফিক পেয়েছেন। জাম্মু ও কাশ্মীরের প্রাদেশিক আমীর ছাড়াও জেলা আমীর ও নায়েম আনসারুল্লাহ্ হিসেবেও সেবা করার তৌফিক পেয়েছেন। স্থানীয় জামা'তে স্থানীয় কর্মকর্তা হিসেবেও কাজ করে গেছেন। বছরের পর বছর আঞ্জুমানে তাহরীকে জাদীদ, ভারতের অনারারী সদস্য ছিলেন। প্রাদেশিক আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় ১৯৮৭ সালে কাশ্মীর উপত্যকায় জামা'তের পক্ষ থেকে পাঁচটি স্কুল স্থাপিত হয়। অনেক মসজিদ ও মিশন হাউস প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি নিরলস পরিশ্রম করেছেন। যুবকদের মেধার উৎকর্ষ সাধন ও তাদের যোগ্য করে তোলার জন্য অনেক চেষ্টাসাধনা করেছেন আর এ কাজে সর্বদা অগ্রগামী থাকতেন। ইয়ারিপুরা এলাকায় তার সমাজকল্যামূলক কাজের জন্য মানুষের মাঝে তিনি অনেক সম্মানিত ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন। তার পরবর্তী প্রজন্মকেও নেক ও সৎকর্ম শীল করুন এবং জামা'তের সেবা করার সুযোগ দিন। (আমীন)

****

৮ পাতার পর.......

না। যেমনটি মা তার সন্তানকে ভালবাসে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে মান্য করার পর ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার উপর আমল করার মাধ্যমে পৃথিবীর জন্য প্রতিটি কর্মের বিষয়ে দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের তৌফিক দান করুন। শান্তি প্রসঙ্গে যে কয়েকটি কথা আমি বর্ণনা করেছি, আমরা যেন সেগুলি নিজেরাও সঠিক অর্থে বাস্তবায়িত করতে পারি। জগতবাসীকে সতর্ক করুন যে, পৃথিবী তার স্বার্থ অর্জন করতে গিয়ে ধ্বংসের গহ্বরের দিকে ধাবিত হচ্ছে। প্রকৃত শান্তি খোদা তা'লার নির্দেশ মান্য করার পথে লাভ হতে পারে, অন্য কোন জাগতিক ব্যবস্থাপনা এর দীর্ঘস্থায়ী প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে না। অতএব এটি প্রত্যেক আহমদীর অনেক বড় দায়িত্ব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর উপর আমল করার তৌফিক দান করুন। অংশ গ্রহণকারীরা জলসার কল্যাণসমূহ অর্জনকারী হোক।...... এবং নিজেদের এলাকায় ইসলামের পবিত্র শিক্ষার আলোকে এক বিপ্লব আনয়নকারী হোক। সমস্ত অংশগ্রহণকারীদেরকে আল্লাহ্ তা'লা নিরাপদে নিজ নিজ বাড়িতে পৌঁছে দিন। কাদিয়ানে যারা এসেছেন তারাও আর যারা গিনি বাসাও-তে এসেছে তারাও যেন নিরাপদে বড়িতে পৌঁছে যায়। আল্লাহ্ তা'লা সকলকে নিরাপত্তা বেষ্টনীতে আশ্রয় দিন।

এখন আমরা দোয়া করব। বিশেষ করে দোয়া করব যে, আল্লাহ্ তা'লা জামাতকে যাবতীয় অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন এবং আমাদের বয়আতের সেই যথার্থ মর্যাদা রক্ষার করার তৌফিক দিন যা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদের কাছে প্রত্যাশা করেছেন। এখন আমরা দোয়া করব।

দোয়ার পর হুযুর আনোয়ার বলেন: এই মুহূর্তে সেখানে যারা বসে জলসা শুনছেন তাদের সংখ্যা হল ২১১৮জন। মোট আটটি দেশ থেকে অতিথিরা জলসায় অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়াও বিভিন্ন স্থানে বসে জলসা শুনছেন, যাদের সংখ্যা অনেক। কাদিয়ানে মোট জলসা শ্রবণকারীর সংখ্যা ৬ হাজারের বেশি হবে।

এরপর হুযুর সমবেত কণ্ঠে নযম পরিবেশনের অনুমতি দেন।পুরুষদের জলসা গাহ থেকে ৮টি দল এবং লাজনা জলসাগাহ থেকে দুটি দল উর্দু, আরবী এবং কাশ্মীরি ভাষায় সমবেতস্বরে নযম পরিবেশ করে।

নযমের পর হুযুর সকলে সালাম জানিয়ে প্রস্থান করেন।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে হুযুরের মূল্যবান উপদেশাবলীর গ্রহণ করার এবং নির্দেশাবলী পালন করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০ পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

ফেলে, তাই সে জাগতিক দিক থেকে বাহ্যত সে অনটনের মধ্যে থাকে, কিন্তু সে সেই দুঃখ-কষ্ট অনুভব করে না। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জাগতিক দুঃখ কষ্টকেও সে সানন্দে স্বীকার করে নেয়। যেভাবে হযরত ইউসুফ (আ.) দোয়া করেছিলেন যে, হে আমার প্রভু! এই জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দের চেয়ে আমার নিকট কারাগার বেশি প্রিয়, যার দিকে এই নারী আমাকে আহ্বান করছে।

(ইউসুফ: ৩৪)

এর বিপরীতে একজন কাফের যেহেতু পৃথিবীকে সব কিছু মনে করে এবং সর্বক্ষণ এর পিছনে ছুটে চলে, জাগতিক ভোগবিলাসে মত্ত থাকে, এটিই তার ধ্যান-জ্ঞান সর্বস্ব হয়ে থাকে। এই বিষয়টিকে বর্ণনা করতে হুযূর (সা.) বলেছেন, পৃথিবী মোমেনের জন্য কারাগার আর কাফেরদের জন্য জান্নাত।

নামাযের বিষয়ে আপনার প্রশ্নের উত্তর হল, যদি ভুল বশত নামায থেকে যায়, তবে যখন মনে পড়বে তখন পড়ে নিবে। এটিই সেই ভুলে যাওয়া নামাযের প্রায়ঃশ্চিত্ত। কিন্তু যদি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগ করা হয় তবে তা অনেক বড় পাপ। এর ক্ষমা হতে পারে তওবা ও ইসতেগফার এবং ভবিষ্যতে এমন ভুল না করার অঙ্গীকারের মাধ্যমে।

প্রশ্ন: ২০২০ সালের ১৫ই নভেম্বর জার্মানীর মুরব্বিদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সময় প্রশ্ন করা হয় যে, কিভাবে আমরা হুযুর আনোয়ারের সুলতানে নাসীর (প্রকৃত সাহায্যকারী) হতে পারি? হুযুর আনোয়ার (আই) এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন: দোয়া ছাড়া যুগ খলীফার 'সুলতানে নাসীর' হওয়া সম্ভব নয়। আর দোয়ার জন্য, আল্লাহ্ তা'লার সর্বাধিক নৈকট্য লাভের জন্য রয়েছে নফল। ফরয তো আপনারা এমনিতেই সম্পাদন করছেন। না করলে মুসলমানদের যে প্রাথমিক শ্রেণীবিভাগ রয়েছে, তার মধ্যেও পড়বেন না। কিন্তু ফরয সম্পাদন করার পর নফল হল আসল বিষয় যা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য এনে দিবে এবং বেশি বেশি খিদমতের সুযোগও এনে দিবে এবং এতে বরকত হবে। আর যুগ খলীফার সুলতানে নাসীর হওয়ারও সুযোগ আসবে। তাই প্রত্যেক মুরব্বীর কর্তব্য হল অন্তত এক ঘন্টা তাহাজ্জুদ পড়া। আজকাল এমনিতেও এক ঘন্টা তাহাজ্জুদ পড়তে কোনও সমস্যা নেই, দুই ঘন্টাও পড়া যেতে পারে। কিন্তু সাধারণ অবস্থাতেও প্রত্যেকের উচিত কম করে এক ঘন্টা করে তাহাজ্জুদ পড়া। যদি কোন অপারগতা, অসুস্থতা, বার্ধক্যজনিত রোগ হয়, তবে তা ভিন্ন কথা। তাছাড়া এটি ছাড়া তো চলে না। এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিন। আজ আমরা অমুক স্টোরে যাব, সেখানে অমুক অমুক নতুন জিনিস এসেছে, বা অমুক কাজ করতে হবে, বা অমুক স্থানে বৈঠক জমেছে, সেখানে গিয়ে আড্ডা দিতে হবে, তাই নিজেদের সময় অপচয় না করে, এসব কথা না ভেবে যিকরে ইলাহির দিকেও বেশি মনোযোগ থাকা উচিত আর নিজেদের আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধির দিকেও দৃষ্টি দেওয়া উচিত। আর আধ্যাত্মিকতার মান সমুন্নত হলে তবেই আপনারা বিপ্লব সাধন করতে পারবেন। কেবল তারানা গেয়ে বা জয়ধ্বনি দিয়ে পৃথিবীতে কখনও বিপ্লব আসে না আর আপনাদের কাজে বরকতও হবে না। তাই প্রথম কথা হল নিজেদের আধ্যাত্মিক অবস্থাকে উন্নত করুন। আর আপনারা যারা মুরুব্বী রয়েছেন, চেষ্টা করুন আপনাদের জামাতের সদস্যদের নিকট অনুকরনীয় দৃষ্টান্ত ও আদর্শ হওয়ার। যাতে আপনাদের দেখে প্রত্যেকে বলতে পারে যে, সত্যিই মুরুব্বী সাহেবের সঙ্গে আল্লাহ্র সম্পর্ক রয়েছে। সেদিকে তিনি মনোযোগও দেন আর মানুষের প্রতিও সহানুভূতিশীলও বটে। আর জামাতের সদস্যদের সঙ্গেও স্নেহ ও ভালবাসাপূর্ণ আচরণ করেন। এই গুণগুলি নিজেদের মধ্যে বিকশিত করলে তবেই আপনারা সফল হবেন। নিজেদের জামাতের তরবীয়ত করে নিতে পারলে জামাত থেকে এমন সব সৎকর্মশীল মানুষ উঠে আসবে যারা আপনাদের সহায়তা করবে এবং আপনাদের কাজেও সহজসাধ্যতা সৃষ্টি হবে।

প্রশ্ন: এই ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানেই আরও একজন প্রশ্ন করেন যে, হুযুর প্রথমেই তাহাজ্জুদ নামাযের কথা উল্লেখ করেছেন। শীতকালে মানুষ সহজেই তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে পারে। কিন্তু নিরবিচ্ছিন্নভাবে এই সব দেশে গ্রীষ্মকালে এর অভ্যাস গড়ে তোলার সর্বোত্তম পন্থা কোনটি? হুযুর আনোয়ার বলেন:

এটা নির্ভর করে আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক কিরূপ তার উপর। তাঁর প্রতি কিরূপ ভালবাসা রয়েছে তার উপর। অন্যান্য কাজকর্মের জন্য সময় বের করে নেন তো? জার্মানীতে যদি রাত দশটায় এশার নামায হয় বা সাড়ে দশটায় নামায হয়, আর আড়াইটে বা পৌনে তিনটায় সকাল হয় (এখানে যুক্তরাজ্যে এরও আগে সকাল সেহরীর সময় হয়ে যায়। সেখানে এক ঘন্টা দেরীতে সেহরী হয়। আধ ঘন্টা বা পৌনে এক ঘন্টার পার্থক্য) তবে দুই ঘন্টা ঘুমান, দেড় ঘন্টা ঘুমিয়ে নিন। এরপর উঠে নামায পড়ুন। এরপর ফজরের নামাযের পর আবার এক-দুই ঘন্টা ঘুমিয়ে নিন। আপনাদের নিজেদেরকেই কর্মসূচি তৈরী করতে হবে। কোন কাজ করার যদি ব্যগ্রতা থাকে তবে সব উপায় বেরিয়ে আসে। জামেয়ায় আপনাদের যখন পরীক্ষা হত আর পড়ার ইচ্ছা থাকত, তখন রাত জেগে পড়তেন কি না? বা কোন উদ্বেগ থাকলে তাহাজ্জুদ পড়েন কি না? এটি তো চিন্তাধারার বিষয়। আপনি যদি নিজের চিন্তাধারাকে সেভাবে পরিচালিত করেন যে অমুক কাজ করতেই হবে, তবে আল্লাহ্ তা'লা সাহায্য করেন। লোকেরা তো রাত্রিতে ঘন্টা দেড়-দুয়েক ঘুমায়। এরপর উঠে তাহাজ্জুদ পড়ে। এরপর সকালে ফজরের নামাযের পর যখন সময় বাকি থাকে তখন ঘুমিয়ে পড়ে। সময় বের করতে হয়। এরপর সারা দিনও আপনি পেয়ে যান। দুপুরে ঘুম পুর্ণ করতে এক ঘন্টা ঘুমিয়ে নিন। এটি তো এমন কোন সমস্যার কথা নয়। ইবাদত যা হওয়ার যৌবনেই হয়। আপনারা তো এখন যুবক। আপনাদেরই সময়। এটিই সময়, এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করুন। আর যতটা সম্ভব সঠিক অর্থে ইবাদত করার চেষ্টা করুন।

প্রশ্ন: সচরাচর দেখা যায় যে, যুব সমাজের অধিকাংশ সময় কাটে বাইরের পরিবেশে, তাদেরকে আমরা কিভাবে জামাতের কাছে টেনে আনব?

হুযুর আনোয়ার বলেন: বেশ তো, যুবক মুরুব্বীদের কাজ হবে এটি। আপনাদের বেড়ে ওঠা, পড়াশোনা সব এখানেই। উচ্চমাধ্যমিক হোক বা স্নাতক বা মাধ্যমিক স্তর, যতদুর আপনারা পড়েছেন, তা থেকে আপনারা এখানকার পরিবেশ সম্পর্কে জেনেছেন।আপনারাও এখানে বাস করেন। সেই অনুসারে দেখুন যে কিভাবে এদের তরবীয়ত করা যায়? এজন্যই আমি বলি যে, বন্ধুত্ব করুন, আর এইজন্যই অঙ্গ সংগঠনগুলিও রয়েছে। অঙ্গ সংগঠনগুলিরও কাজ হল ছেলেদেরকে নিজেদের সঙ্গে যুক্ত করা আর যতজন যুবক মুরুব্বী রয়েছেন, তাদের কাজ হল এদের সাহায্য করা। এভাবে কাজ করলে সংশোধন হবে ইনশাআল্লাহ্। এটা তো চেষ্টা করতে হবে, মানছি পরিবেশ প্রতিকুল, পরিবেশই তো আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ। এই পরিবেশেই তাদের পরিস্থিতি অনুসারে আমাদের চেষ্টা করতে হবে। কোন নতুন জিনিস তো নেই, কোন নতুন সূত্র নেই যা আপনি প্রয়োগ করবেন আর সমস্ত মানুষের সংশোধন হয়ে যাবে আর সকলে ওলীউল্লাহ্ হয়ে উঠবে। এমনটি হবে না। আর আপনি একদিনেও এই কাজ করে উঠতে পারবেন না। এটি নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা। যাতে জামাতের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বজায় থাকে আর তাদের মধ্যে এই অনুভূতি থাকে যে, তাদেরও একটি দায়িত্ব রয়েছে যা তাদের পূর্ণ করতে হবে। এই চেতনাবোধ ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে তৈরী করতে হবে। আপনাদের সংগঠনের সদস্যরা, খুদ্দাম, লাজনা ও আনসারদের সঙ্গে যতবেশি যোগাযোগ করবে, এর ততবেশি প্রভাব পড়বে। মুরুব্বীরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় যতবেশি সময় ব্যয় করবেন, ততবেশি উপকার হবে। এটি এক নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা। এর জন্য কোন দ্রুত সমাধানসূত্র তৈরী করা সম্ভব নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির পরিস্থিতি ও মানসিকতা অনুসারে এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে আর আপনারা যারা যুবক মুরুব্বী রয়েছেন, তাদের উপর আস্থা রাখা হয়েছে যে, আপনারা সেখানকার প্রশিক্ষিত, তারা বেশি ভালভাবে এই তরবীয়তের কাজটি করতে পারবে। যদি আপনাদের নিজেদের তরবীয়ত যথোপযুক্ত হয়ে যায় আর যেমনটি আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে, আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী হলে আপনারা দেখবেন বিপ্লব আনয়নকারী হবেন ইনশাআল্লাহ্। আর আমি আশা করি, ইনশাআল্লাহ্ যুবক মুরুব্বীরা যদি এক সংকল্প নিয়ে উঠে দাঁড়ায়, তবে এক বিপ্লব সাধন করতে পারে। কেননা আপনারা এখানকার পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন। পূর্বে কেউ পাকিস্তান থেকে আসত বা বাইরের কোনও দেশ থেকে মুরুব্বী আসত, যারা সঠিকভাবে এখানকার পরিবেশ সম্পর্কে জানত না। এখানকার ভাষাতেও সাবলীল ছিল না। আপনারা তো এখানকার ভাষায় পারদর্শী, ভাষার গূঢ় অর্থ বোঝেন আর সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেন। এখানকার পরিবেশে থেকেছেন তাই পরিবেশ সম্পর্কেও ভালভাবে জানেন। অনুরূপভাবে আপনারা নিজেও নতুন নতুন পথ খুঁজুন যে কিভাবে তরবীয়ত করতে হবে, কিভাবে তাদেরকে বেঁধে রাখতে হবে আর নতুন প্রজন্মকে ধ্বংস হওয়া থেকে কিভাবে রক্ষা করতে হবে।

প্রশ্ন: উক্ত ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে এক মুরুব্বী নিবেদন করেন যে, কিছু ভিন্ন জাতির মানুষও জামাত আহমদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, তারা জামাতের জ্ঞান-ভাণ্ডার দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। কিন্তু জামাতী ব্যবস্থাপনা এবং বিশেষ করে আর্থিক কুরবানীতে পূর্ণত অংশগ্রহণ করতে পারে না; স্থানীয় জামাতের সঙ্গেও তাদের দৃঢ় যোগাযোগ থাকে না।এ বিষয়ে হুযুর আনোয়ারের দিক-নির্দেশনা চাই।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কথা হল জামাতী ব্যবস্থাপনাকেও তাদের জন্য এতটা দুবোধ্য করে তুলবেন না। এই জন্যই হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) শুরুর দিকে একথাই বলেছিলেন আর তাঁর পূর্বের খলীফাগণও বলে এসেছেন, আমিও একথাই বলব যে, নবাগত আহমদী বা নওমোবাঈনরা যখন আসে আর তারা নিজেদেরকে আপনাদের সঙ্গে যুক্ত করে, তখন তাদেরকে প্রথম তিন বছর বোঝান যে ব্যবস্থাপনাটা কি? তাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করবেন না যেন তারা কোনও ওলী উল্লাহ্, বা সাহাবাদের সন্তান বা জন্মগত আহমদী। বরং জন্মগত আহমদীদেরই কম জানা থাকে, আর নবাগতদের ধর্মীয় জ্ঞানও আপনাদের থেকে বেশি থাকে। প্রায় আমি দেখেছি, যারা চিন্তাভাবনা করে জামাতে এসেছে, তারা নামাযের প্রতিও মনোযোগী হয়, ইসতেগফকারীও হয়, তাহাজ্জুদ আদাকারীও হয় আর তারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর বই-পুস্তককে অন্যদের থেকে বেশি বোঝার চেষ্টাও করে থাকে। তাই যারা জামাতে নবাগত, তাদেরকে সমস্ত বিষয়ে নিয়মনিষ্ঠ করে তোলা আমাদের কাজ নয়। (ক্রমশ.......)

আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং কুরআন মজীদের রক্ষক

-মৌলানা মহম্মদ হামীদ কওসার, নাযির দাওয়াতে ইলাল্লাহ্, দক্ষিণ ভারত

৭ নং আপত্তি।

সমালোচকরা কুরআন মজীদের পাঁচটি আয়াত বের করে এই বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করেছে যে, এগুলিতে কুরআন মজীদ উৎকৃষ্ট শিক্ষা বর্ণনা করেছে। সমালোচকদের মতে এই পাঁচটি আয়াত আল্লাহ্‌র বাণী। কিন্তু যে ২৬ টি আয়াত তারা উপস্থাপন করেছে, তাদের মতে সেগুলি আল্লাহ্‌র বাণী নয়, পরবর্তীকালে সংযোজন করা হয়েছে।

উত্তর: এই আলোচনার পূর্বের পৃষ্ঠাগুলিতে অত্যন্ত সুদৃঢ় দলিল প্রমাণসহকারে প্রমাণ করা হয়েছে যে কুরআন করীমে বিসমিল্লাহ্-র 'বে' থেকে ওয়ান্নাস-এর 'সিন' পর্যন্ত পুরোটাই আল্লাহ্‌র বাণী, যা তিনি জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে সৈয়্যদানা হযরত মহম্মদ (সা.)-এর উপর নাযেল করেছেন। আর হুযুর (সা.)-এর মাধ্যমে এই বাণী হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মুসলমানদের স্মৃতিতে অক্ষত অবস্থায় সঞ্চারিত হয়েছে এবং আজও হয়ে আসছে। সুতরাং এই আয়াতগুলির ব্যাখ্যার প্রয়োজন কিম্বা প্রমাণ কোনটিই নেই।

কুরআন করীমে এমন প্রত্যেক বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে যা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত মানুষের প্রয়োজনে আসতে পারে। এতে আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদকে সুদৃঢ় যুক্তিপূর্ণ প্রমাণের মাধ্যমে স্পষ্ট করা হয়েছে। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি এবং এর গোপন রহস্যাবলীকে সুস্পষ্ট প্রমাণের মাধ্যমে উন্মোচিত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে মানব জীবনের বিভিন্ন দিকের জন্য যে প্রয়োজনসমূহ ছিল, সে সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। যেমন সমাজ-ব্যবস্থা থেকে শুরু করে দাম্পত্য জীবন এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়, সন্তান প্রতিপালন- মোট কথা কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, কুরআন করীমে মানুষের সেই সব অবস্থা এবং প্রয়োজনের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে যা সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনশীল। এবং প্রত্যেক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পথনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। যেমন, কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন নামাযের পূর্বে পানি দিয়ে ওজু কর। সেই সঙ্গে এই নির্দেশও দেওয়া হয়েছে যে, যদি পানি না পাওয়া যায় তবে মাটি দ্বারা 'তাইয়াম্মাম' করে নিতে। فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا (সুরা মায়েদা: ৭) অতএব, শুকনো পরিচ্ছন্ন মাটিতে তাইয়াম্মুম করে নিও। লক্ষ্য করুন, ওজুর বিষয়টিতেও দুটি অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সাধারণ অবস্থায় প্রত্যেক সুস্থ মুসলমানের জন্য নামাযের পূর্বে পানি দ্বারা ওজু করা কর্তব্য। কিন্তু অন্য অবস্থার কথায় বলা হয়েছে যে, যদি পানি না পাওয়া যায়, তবে পরিস্কার মাটি দ্বারা তাইয়াম্মুম করে নামায পড়তে হবে। তাই নদী ও ঝরণার পাশে বসবাসকারী কোন ব্যক্তি যদি বলে 'আমার জন্য তো সব সময় পানির ব্যবস্থা আছে, পানি দিয়েই ওজু করতে পারি। অতএব, তাইয়াম্মুমের নির্দেশটি আমি কুরআন থেকে মুছে ফেলছি। কেননা আমার এর প্রয়োজন নেই। তখন প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি এমন চিন্তাধারার মানুষকে বোঝাবে যে, কুরআন করীমের এই আদেশটি কেবল তোমার একার জন্যই নয়। বরং আফিক্রার জঙ্গল ও মরুভূমিতেও মুসলমানরা বাস করে, যাদের কাছে এক ফোঁটা পানিও নেই, তাই তারা সেখানে আল্লাহ্ তা'লার দ্বিতীয় আদেশ অনুসারে তাইয়াম্মুম করে নামায পড়বে। অতএব, স্পষ্ট হল যে, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে কুরআন মজীদের নির্দেশ ও শিক্ষাও ভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়।

সৈয়্যদানা মহম্মদ (সা.) এবং মুসলমানদের যুগ দুটি অংশে বিভক্ত। ১) মক্কার যুগ: এই তেরো বছরে আল্লাহ্ তা'লা সৈয়্যদানা মহম্মদ (সা.)কে জুলুম ও অত্যাচার সহন করার এবং ধৈর্য ধারণের শিক্ষা দিয়েছেন। ২) মদীনার যুগ: মক্কার কাফেররা যখন মুসলমানদের উপর আক্রমণ করতে মদীনা পর্যন্ত পৌঁছে গেল, তখন আল্লাহ্ তা'লা সেযুগের মুসলমানরেকে আত্মরক্ষার বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন, সে সম্পর্কে পথপ্রদর্শন করেছেন।

উভয় যুগে পরিস্থিতি এবং চাহিদা ভিন্ন ভিন্ন ছিল। আপত্তিকারীরা ২৬টি আয়াত তুলে ধরে যেভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে এর মধ্যে সন্ত্রাসের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। কুরআন করীমের শিক্ষা অনুধাবন করলে জানা যাবে যে, মুসলমানরা যখন আত্মরক্ষার তাগিদে কোমর বেঁধেছিল, তার প্রেক্ষাপট ছিল একেবারে ভিন্ন। অথচ মুসলমানেরা মদিনায় থাকাকালীনও কোনও প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ চাইছিল না। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে নির্দেশ দিয়েছেন-

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

এছাড়া সেই আয়াতগুলিও নাযেল হয়েছে যেগুলি সম্পর্কে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের দাবি, এগুলিতে নাকি সন্ত্রাস ও বর্বরতার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কুরআন মজীদে বিদ্যমান এই আয়াতগুলিকে যদি সন্ত্রাসের কারণ বলা যায়, তবে এই নিয়ম বিনা ব্যতিক্রমে সমস্ত ধর্মীয় গ্রন্থের জন্যই প্রযোজ্য হওয়া উচিত। বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল।

তওরাত ও বাইবেলে বর্ণিত যুদ্ধ সংক্রান্ত শিক্ষা।

যখন খোদাওয়ান্দ তোমার খোদা একে অর্থাৎ কোন শহরকে তোমার করায়ত্তে এনে দেয়,তখন সেখানকার প্রত্যেক পুরুষকে তরবারির আঘাতে হত্যা কর, কিন্তু শহরের মহিলা, শিশু এবং গৃহপালিত জীবজন্তুদের লুট করে নাও নিজেদের জন্য।

(দ্বিতীয় অধ্যায়, বাব-২০, আয়াত: ১৩-১৪)

সেই সব জাতির শহরগুলির কোন জীবকে জীবিত রেখো না, যেগুলিকে খোদা ওয়ান্দ খোদা তোমাদেরকে উত্তরাধিকারী করেছেন।'

(দ্বিতীয় অধ্যায়, বাব-২০, আয়াত: ১৩-১৪)

ইঞ্জিলে হযরত ঈসা (আ.)-এর বক্তব্য লিপিবব্ধ আছে যে, 'একথা মনে করো না যে আমি পৃথিবীতে সন্ধি করতে করতে এসেছি, সন্ধি নয়, বরং আমি অসি চালনা করতে এসেছি।'

(ইঞ্জিল, মতি, বাব-১০, আয়াত: ৩৪)

যুদ্ধ সম্পর্কে গীতার শিক্ষা

অনুরূপভাবে আমাদের দেশ ভারতে শ্রী কৃষ্ণ মহারাজ-এর আদেশে কুরুক্ষেত্রের ময়দানে ১৮ দিন পর্যন্ত মহাভারতের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আর অর্জুন যখন নিজের ধনুক ফেলে দিয়ে অনীহাসহকারে বসে পড়ল এবং যুদ্ধ করতে অস্বীকার করল, তখন যদিও তাঁর প্রতিপক্ষে গুরু তথা নিকটাত্মীয় দ্রোণাচার্যও ছিলেন, তা সত্ত্বেও কৃষ্ণ মহারাজ তাঁকে যুদ্ধের উপদেশ দিলেন। তিনি অর্জুনকে বললেন-

অনুবাদ: এবং নিজের ধর্মকে দেখেও তোমার শঙ্কিত হওয়া উচিত নয়, কেননা যোদ্ধার জন্য ধর্মযুদ্ধ অপেক্ষা কোনও কর্ম নেই যা তার উন্নতির কারণ হতে পারে।

অনুবাদ: হে পার্থ! ধন্য সেই যোদ্ধা যার জন্য স্বর্গের পথ উন্মোচনকারী এমন ধর্মযুদ্ধ অনাহুত ভাবে এসেছে।

অনুবাদ (৩৩) : এবং সকলে বহুদিন পর্যন্ত তোমার দুর্নাম গাইবে। সম্মানীয় ব্যক্তির জন্য দুর্নাম মৃত্যুর চাইতে নিকৃষ্ট।

অনুবাদ: ৩৫) : তোমার শত্রুরা তোমার বিরুদ্ধে অবমাননাকর ভাষা ব্যবহার করবে। তোমার ক্ষমতা নিয়ে উপহাস করবে, এর চেয়ে দুঃখের আর কি হতে পারে?

অনুবাদ: ৩৭) মারা গেলে স্বর্গে যাবে। যদি বিজয়ী হও, তবে পৃথিবীর রাজত্ব ও আনন্দ লাভ করবে। অতএব, হে কুন্তী তনয়! তুমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।

অনুবাদ: ৩৮) সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি এবং জয়-পরাজয়কে সমান মনে করে যুদ্ধের জন্য উদ্যম সহকারে প্রস্তুত হও। এতে তোমার পাপ হবে না।

(শ্রীমদ ভগবত গীতা, সংকলন-পরম সন্ত পূর্ণ ধনী মহাঋষি শিবব্রত লাল মহারাজ, প্রকাশকাল: ১৯৭৭)

আমাদের দেশে হিন্দুরা দশমির উৎসব অত্যন্ত উৎসাহ ও ভক্তিভরে উদযাপন করে থাকে। রামলীলা এবং ধারাবাহিকগুলিতে রামচন্দ্রের লঙ্কা আক্রমণ, এবং রাবণ ও তার সঙ্গীদের পর্যদুস্ত করার দৃশ্য দেখানো হয়। আবেদনকারীর সমচিন্তক কোন ব্যক্তি যদি আপত্তি করে যে, এই সব দৃশ্য দেখে তো অনেক যুবক রামচন্দ্রের ন্যায় শত্রুকে রাবণ মনে করে হত্যা করে ফেলবে, কিম্বা তাদের মনে প্রতিশোধমূলক চিন্তাধারার উদ্রেক হবে। এই কারণে আবেদনকারী এই উৎসবের উপর নিষেধাজ্ঞা চাপানোর আবেদন করবে কি? কখনই নয়।

আপত্তিকারীরা প্রথমত এমন দৃশ্য অবতারণা করার চেষ্টা করেছে যে কুরআন মজীদে অধিকাংশ স্থানে মানবতার জন্য গঠনমূলক এবং সমৃদ্ধিমূলক শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এবং অন্যত্র যুদ্ধের শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে আর নিন্দুকদের কাছে (আল ইয়াযু বিল্লাহ) সেগুলি বিলোপ করা উচিত।

নিন্দুকদের উচিত ইহুদী ও নাসারাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ নিউ টেস্টামেন্ট এবং ওল্ড টেস্টামেন্ট গভীর অভিনিবেশসহকারে অধ্যায়ন করা। এতেও ইতিবাচক শিক্ষা রয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে যুদ্ধের বিষয়ক শিক্ষাও রয়েছে।

এছাড়া সমালোচকদের গীতাও অধ্যয়ন করা উচিত। শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ এই গ্রন্থে একদিকে বহু মূল্যবান সব উপদেশ বাণী দিয়েছেন, অপরদিকে যুদ্ধের প্রণোদনাও দিয়েছেন, যার বিবরণ ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে।

অতএব, এই উদাহরণগুলি থেকে সমালোচকদের বুঝে যাওয়া উচিত যে, কুরআন মজীদ যুদ্ধনিবৃত্তি সম্পর্কেও শিক্ষা দিয়েছে অনুরূপভাবে যদি জোর করে যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়, তবে সেই অবস্থাতেও দিক-নির্দেশনা দান করেছে। যদি না যুদ্ধের বিষয়ে দিক-নির্দেশনা থাকত, তবে এমন আপত্তি অবশ্যই উঠত যে, এই গ্রন্থ পরিপূর্ণ নয়। কেননা এতে শত্রুদের মোকাবেলা করার শিক্ষা দেওয়া হয় নি অথচ এই গ্রন্থে এই শিক্ষাও দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানদের দুটি পক্ষের মধ্যে যদি সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, সেক্ষেত্রে কি কি করণীয়? (ক্রমশ........)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান — Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 — Vol-7 Thursday, 3 Feb, 2022 Issue No. 5

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

ভবিষ্যত প্রজন্মের তরবীয়ত এবং তাদেরকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং তাদের ধর্মকে রক্ষা করা আপনাদের কাজ। লজ্জাশীলতা হল নারীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

মায়েরা যদি পর্দা মেনে চলে এবং কন্যা সন্তানকে এর গুরুত্ব সম্পর্কে বলে, তবে নিশ্চয় তাদের উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। আধুনিক প্রযুক্তি মানুষের ব্যস্ততা এবং আগ্রহের মধ্যে আমুল পরিবর্তন এনেছে। সকলের জন্য টিভি ও ইন্টারনেট বর্তমানে অশ্লীলতার পর্যায়ে পড়েছে। তাই ইন্টারনেট ও এই ধরণের প্রযুক্তির বিষয়ে অনেক সতর্ক থাকতে হবে। ক্ষতিকর কোন অনুষ্ঠান যদি তারা দেখে , তবে এর জন্য মা-বাবা দায়ী হবে।

বারো তেরো বছরের বয়সের মেয়েরাও সাবালিকা হয়ে যায়, তাই তাদেরও দাযিত্ব হল এসব থেকে বিরত থাকা।

আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে তৌফিক দিন ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিয়ে আল্লাহ্র বিধিনিষে মেনে চলার এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের ধর্মীয় দিককে রক্ষা করে তাদেরকে খোদা তা'লার সঙ্গো যুক্ত করার।

লাজনা ইমাউল্লাহ্ ভারতের ২০২১ সালের বাৎসরিক ইজতেমা উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.) হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর বার্তা

ইসলামাবাদ, যুক্তরাজ্য,
১৭-১০-২১

লাজনা ইমাউল্লাহ্ ভারতের প্রিয় সদস্যাবর্গ!

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহ

আমি একথা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম যে, লাজনা ইমাউল্লাহ্ ভারত তাদের বাৎসরিক ইজতেমা আয়োজনের তৌফিক পাচ্ছে। এই উপলক্ষ্যে আমাকে বার্তা প্রেরণের অনুরোধ করা হয়েছে। আমার দোয়া এই যে আল্লাহ্ তালা সার্বিকভাবে আপনাদের আয়োজনকে সাফল্যমণ্ডিত করুন। এই উপলক্ষ্যে আমি আপনাদেরকে আপনাদের দায়িত্বাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

আল্লাহ্ তা ”লা কুরআন মজীদে বলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর এবং প্রত্যেককেই চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, আগামীকালের জন্য সে অগ্রে কি প্রেরণ করিয়াছে। এবং তোমরা আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর, তোমরা যে কর্মই কর উহা সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ খবর রাখেন। (আল হাশর: ১৯)

এখানে আল্লাহ্ তা'লা ঈমান আনয়নের পর তাকওয়া অবলম্বনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এবং বলেছেন যে, তাকওয়ার পথে পদচারণাকারী প্রত্যেক ব্যক্তির কাজ হল নিজের ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখা। ভবিষ্যত প্রজন্মের তরবীয়ত এবং তাদেরকে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং তাদের ধর্মকে রক্ষা করা আপনাদের কাজ। আজকের মা এবং ভাবী মায়েদের একথা উপলব্ধি করতে হবে, আত্মসমীক্ষা করতে হবে এবং নিজেদের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করতে হবে। ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকার পূর্ণ করতে যথাসাধ্য নিজের শক্তিবৃত্তিকে কাজে লাগাতে হবে ।

পৃথিবী বর্তমানকালে অত্যন্ত দ্রুত খোদা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় আমাদের সব থেকে বড় দায়িত্ব হল নিজেদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া। নিজেদেরকে এবং সন্তানদেরকে এই পরিবেশের প্রভাব থেকে রক্ষা করা।সন্তানের সামনে নিজেদের আদর্শ তুলে ধরা, যাতে শিশুরা বড়দের সেই আদর্শ অনুসরণ করে যা তাদেরকে ধর্মের দিকে নিয়ে যায়, যা আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা আকর্ষন করে ইহজগত ও পরজগতকে সুসজ্জিত করে। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, নারীকে তার পরিবার ও স্বামীর তত্ত্বাবধায়ক বানানো হয়েছে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে পরিবার ও সন্তানের তত্ত্বাবধায়ক ও রক্ষকের ভূমিকা পালনের দায়িত্ব স্ত্রীর উপর বর্তায়।

(সহী বুখারী, কিতাবুন নিকাহ)

অনুরূপভাবে লজ্জাশীলতা হল নারীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পাঁচ ছয় বছর বয়স থেকেই মেয়েদেরকে বোঝাতে হবে যে এই সমাজ তোমাদের অনুসরণের মাধ্যমে। মায়েরা যদি পর্দা মেনে চলে এবং কন্যা সন্তানকে এর গুরুত্ব সম্পর্কে বলে, তবে নিশ্চয় তাদের উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

এই যুগে আধুনিক প্রযুক্তি মানুষের ব্যস্ততা এবং আগ্রহের মধ্যে আমুল পরিবর্তন এনেছে। দশ বারো বছরের মেয়েদের থেকে শুরু করে যুবতীরা পর্যন্ত, সকলের জন্য টিভি ও ইন্টারনেট বর্তমানে অশ্লীলতার পর্যায়ে পড়েছে। তাই ইন্টারনেট ও এই ধরণের প্রযুক্তির বিষয়ে অনেক সতর্ক থাকতে হবে। ক্ষতিকর কোন অনুষ্ঠান যদি তারা দেখে , তবে এর জন্য মা-বাবার দায়ী হবে।আর বারো তেরো বছরের বয়সের মেয়েরাও সাবালিকা হয়ে যায়, তাই তাদেরও দাযিত্ব হল এসব থেকে বিরত থাকা। আপনারা আহমদী আর একজন একজন আহমদীর ভূমিকা এমন হতে হবে সকলের জন্য তা অনন্য হয়। দেখে বোঝা যায় যে এটা আহমদী মেয়ে।

আপনাদের উপর আল্লাহ্ তা'লার কত বড় অনুগ্রহ যে তিনি আপনাদেরকে যুগের ইমামকে মান্য করার তৌফিক দান করেছেন। এবং 'খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়্যত'-এর সঙ্গো সম্পৃক্ত করেছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, আমার সঙ্গো বয়আতের অঙ্গীকার থাকলে নিজের আমল সেই শিক্ষা সম্মত কর যা খোদা তা'লা একজন মোমেনের জন্য বর্ণনা করেছেন। অন্যথায় বয়আতের দাবি করা নিছক মৌখিক দাবি হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহ্ তা'লা মৃত্যুর পর একথা জিজ্ঞাসা করবেন না যে, কি পরিমাণ জমি-জমা ও ধন-সম্পত্তি রেখে এসেছ বা কতজন সন্তান রেখে এসেছ? তিনি কেবল প্রশ্ন করবেন যে তোমার কর্ম কি ছিল? তুমি নিজের মধ্যে কি পবিত্র পরিবর্তন তৈরী করতে পেরেছিলে? তুমি কি আল্লাহ্ তা'লার বিধিনিষেধ শিরোধার্য করেছিলে? তুমি নিজে এবং তোমার সন্তানেরা কি সঠিক অর্থে ইবাদত করার চেষ্টা করেছিলে? তুমি কি তোমার স্বামীকে বলেছিলে যে তোমার অর্থকড়ির থেকে বেশি তোমার ইবাদত আমার বেশি প্রিয়? তুমি যদি সন্তানের সামনে এমন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন কর যা আল্লাহ্ তা'লার দিকে নিয়ে যায়, তবে তা আমার নিকট বেশি প্রিয়- তুমি তাকে একথা বলেছিলে? যদি এই প্রশ্নগুলির উত্তর হ্যাঁ হয়, তবে সেই মহিলারা নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করে ইহকাল ও পরকালের জান্নাতের অধিকারী হয়েছে। অতএব নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হন এবং সেগুলিকে সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের মাধ্যমে নিজেদের ইহকাল ও পরকাল সুসজ্জিত করুন।

আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে তৌফিক দিন ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিয়ে আল্লাহ্র বিধিনিষেধ মেনে চলার এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের ধর্মীয় দিকটিকে রক্ষা করে তাদেরকে খোদা তা'লার সঙ্গো যুক্ত করার।

ওয়াসসালাম খাকসার
মির্যা মসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ আল খামিস

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir